উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP)ঃ প্রাথমিক ধারণা এবং বাংলাদেশে সম্ভাবনা

Basic Concept of Good Agricultural Practices and its prospect in Bangladesh

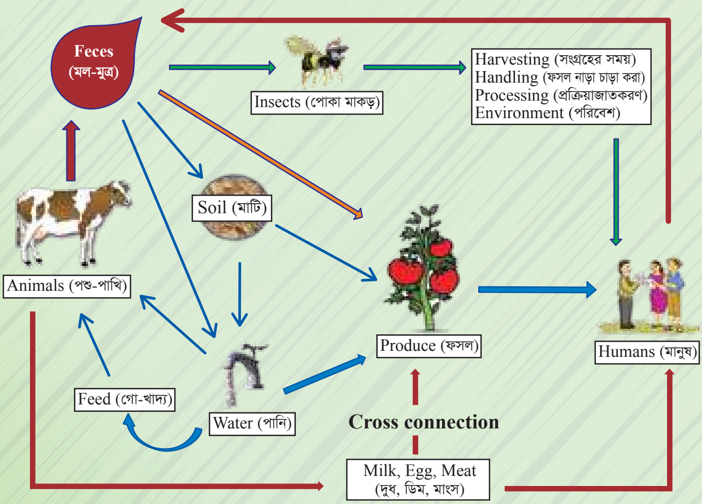

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, যশোর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP): প্রাথমিক ধারণা এবং বাংলাদেশে সম্ভাবনা

Basic Concept of Good Agricultural Practices and its prospect in Bangladesh

রচনা ও সংকলন

মনিরুল ইসলাম
ড. মদন গোপাল সাহা
ড. মার্টিন লু
ড. মো. সিরাজুল ইসলাম
ড. মো. আলতাফ হোসেন
ড. সালেহ আহমেদ
মো. কামরুল ইসলাম

সম্পাদনায়

ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী
ড. পরিতোষ কুমার মালাকার
ড. মো. লুৎফর রহমান
মো. শোয়েব হাসান
মো. হাসান হাফিজুর রহমান
ড. মো. ওমর আলী

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, যশোর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রকাশকাল
জুন ২০১৭
২০০০ কপি

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

স্বত্ব সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে
লুবনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৫৬, ভজহরি সাহা স্ট্রিট, নারিন্দা
ওয়ারী, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৬৪৫৪০

ভূমিকা

আমেরিকায় গবেষণায় দেখা গেছে অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের জন্য প্রতিবছর ছিয়াত্তর মিলিয়ন মানুষ অসুস্থ্য হয়ে পড়ছে। তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকে এবং পাঁচ হাজার দুইশ মানুষ খাদ্যজনিত সমস্যার কারণে মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং আমাদের প্রতিদিন নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। কারণ মানুষই একমাত্র জীব যারা পরিবেশ থেকে সকল সুবিধা গ্রহণ করতে পারে আবার মানুষই একমাত্র জীব যারা পরিবেশে বিরাজমান বিভিন্ন প্রকার দূষণ দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হতে পারে। আর নিরাপদ খাদ্য মানে সঠিক উপায়ে খাদ্যের উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, পরিবহন এবং খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করা। বর্তমান সময়ে ভোক্তারা নিরাপদ খাদ্য, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক সচেতন । উত্তম কৃষি পদ্ধতি হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব চাষ এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এর সহায়ক। উত্তম কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব।

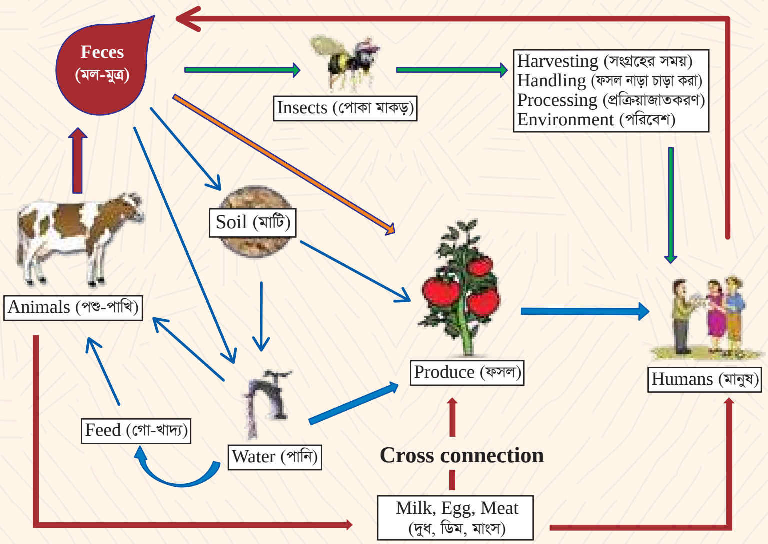

চিত্র : পরিবেশ দূষণ চক্র

উত্তম কৃষি পদ্ধতি কি ও কাকে বলে

১. উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) হচ্ছে এমন একটি চর্চা যা কৃষি পণ্য উৎপাদন ও প্রসেসিং এর জন্য পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্থায়ীত্ব বুঝায় যার ফলে নিরাপদ এবং গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ও অন্যান্য কৃষি পণ্য উৎপাদন

নিশ্চিত হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে- উত্তম কৃষি পদ্ধতি হলো খাদ্যের উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি এবং পরিবহন এর উপর সমন্বিত কিছু নিয়ম-কানুন এবং প্রযুক্তিগত সুপারিশ যার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, মানুষের সু-স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সম্ভব।

(সূত্র : FAO COAG 2003 GAP paper)।

২. উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) হলো এক ধরনের পদ্ধতি যা সামগ্রিক কৃষি কার্যক্রমের পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুসংহত করে। ফলশ্রুতিতে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত কৃষিজাত পণ্য সহজলভ্য হয়। একগুচ্ছ নীতি-বিধি এবং প্রযুক্তিগত সুপারিশমালা যা সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবহনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করা হয় যা মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও কাজের পরিবেশ উন্নত করে।

(সূত্র : হাসান ও অন্যান্য, ২০১৫)

উত্তম কৃষি পদ্ধতির চারটি স্তম্ভ হলো -

১। অর্থনৈতিক সমাধান
২। পরিবেশগত স্থায়ী সমাধান
৩। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা
৪। নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন।

উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রধানত যারা উপকৃত হবেন।

- কৃষক এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ স্বাস্থ্যকর এবং গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবেন।
- কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ফসলে গুণগতমান বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চ বাজারদর নিশ্চিত করতে পারবেন।
- ভোক্তাগণ নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করতে পারবেন।
- জনসাধারণ উপভোগ করতে পারবে একটি সুন্দর কৃষি পরিবেশ।

উত্তম কৃষি পদ্ধতি মূলত কি করে ?

- **জন নিরাপত্তা**
  - কৃষিকাজে নিয়োজিত মাঠকর্মী এবং ভোক্তাগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে।
  - কৃষি পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে।
  - খাদ্য নিরাপত্তা তরান্বিত করে।

- **পরিবেশ**

  ✻ মাটি ও পানিকে দূষণ থেকে রক্ষা করে।

  ✻ রাসায়নিক উপাদানের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করে।

  ✻ জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করে।

- **খাদ্য নিরাপত্তা**

  ✻ স্বাস্থ্যকর, দূষণহীন এবং উচ্চ মানসম্পন্ন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে

- **পশু-পাখির যত্ন**

  ✻ সঠিকভাবে পশু-পাখির যত্ন নেওয়া এবং পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে

চিত্র : উত্তম কৃষি পদ্ধতির মূল লক্ষ্য

উত্তম কৃষি পদ্ধতির মৌলিক বিষয়সমূহ

উত্তম কৃষি পদ্ধতির মূলনীতিগুলো হলো-

১। পরিষ্কার মাঠ/মাটি
২। পরিষ্কার পানি

৩। পরিষ্কার হাত
৪। পরিষ্কার কাজের জায়গা

এই মূলনীতিগুলো অবশ্যই নিম্নলিখিত ধাপসমূহে অনুসরণ করতে হবে।

১। জমি নির্বাচন
২। জমি তৈরি
৩। ফসল উৎপাদনের সময়
৪। ফসল সংগ্রহ এবং
৫। ফসল সংগ্রহোত্তর সময়

১। পরিষ্কার মাটি/মাঠ

- পরিষ্কার মাঠ বা মাটি, মাটির মধ্যে দূষণকারী অণুজীবসমূহের উপস্থিতির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় যা মূলত বিভিন্ন জৈব সার ও অন্যান্য পশু-পাখির মল-মূত্র থেকে হতে পারে।
- উত্তম কৃষি পদ্ধতি এই জৈব সারগুলোর সঠিকভাবে পচানো, ব্যবহার এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করে।
- গৃহপালিত পশু-পাখি ফসলের মাঠ থেকে দূরে রাখার মাধ্যমে মাটিতে দূষণকারী অণুজীবের উপস্থিতি কমায়।

২। পরিষ্কার পানি

- পরিষ্কার পানি বলতে বুঝায় যে, ফল-মূল বা শাক-সবজি ধৌত করা, ঠাণ্ডা করা এবং অন্যান্য কাজে যে পানি ব্যবহার করা হয় তা অবশ্যই খাওয়ার উপযোগী পানি।
- প্যাকিং এর সময় যে বরফ ব্যবহার করা হয় তাও অবশ্যই খাওয়ার উপযোগী পানি দিয়ে করতে হবে।
- পুকুর বা নালার পানি হলে তা অবশ্যই পশু-পাখি দ্বারা দূষণ এবং অন্য কোন মাধ্যমের নোংরা পানি থেকে মুক্ত হতে হবে।
- সেচের জন্য এবং স্প্রে করার কাজে যে পানি ব্যবহৃত হবে তা অবশ্যই মনুষ্য বাহিত রোগ জীবাণু থেকে মুক্ত থাকতে হবে।
- পুকুর ও নালার পানি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অবশ্যই নিয়মিত তার গুণাগুণ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩। পরিষ্কার হাত

- পরিষ্কার হাত বলতে ফসলের মাঠে ও প্যাকিং হাউজে কর্মরত মাঠ কর্মীদের নিজস্ব পরিষ্কার পারিচ্ছন্নতা বুঝায়।

- ❋ সকল প্রকার কাজ যেমন: মাঠ পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহ, ফসল বাছাইকরণ, ফসল প্যাকিং ইত্যাদি সকল কাজের আগে মাঠ কর্মীদের অবশ্যই ভালো করে হাত ধৌত করতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতে হবে।
- ❋ ক্রেতারা যারা মালামাল/ফসল কিনতে আসবে তাদের জন্যও হাত বা শরীরের অন্যান্য অংশ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজের জায়গা

- ❋ প্যাকিং করার বাক্স, প্যাকিং এর কাজে ব্যবহৃত জায়গা/টেবিল/মেঝে, সংরক্ষণাগার, পরিবহনকারী ট্রাক/গাড়ী ইত্যাদি অবশ্যই নিয়মিত ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
- ❋ ফসলের মাঠে, প্যাকিং হাউজে, পরিবহন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত সকল প্রকার যন্ত্রাংশ কাজের আগে এবং পরে অবশ্যই প্রতিদিন পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ❋ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রত্যেকটি কাজের জন্য একটি হিসাব রাখার খাতা পরিচালনা করতে হবে। যেখানে সকল প্রকার তথ্যাদি নিয়মিত প্রতিদিন লিখিত আকারে থাকবে।
- ❋ রেকর্ড কিপিং খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ❋ খাদ্যজনিত কোন রোগ-বালাই হলে তা অবশ্যই অতি তাড়াতাড়ি দূষণের জায়গা খোঁজ করে বের করতে হবে এবং তার সমাধান করতে হবে।

উত্তম কৃষি পদ্ধতির সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ

১। সঠিকভাবে GAP এর পর্যবেক্ষণ ও গ্রহণ এর মাধ্যমে নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

২। উত্তম কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন এবং নির্দেশনা মোতাবেক গ্রহণযোগ্য বালাইনাশক এবং দূষণ হওয়ার যে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অনুসরণ করে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যে রাসায়নিক, শারিরিক এবং জীবাণুগত ক্ষতি সমূহের ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব।

৩। উত্তম কৃষি পদ্ধতি টেকসই কৃষিকাজে উৎসাহ বৃদ্ধি করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহ পরিপূর্ণ করতে সহায়তা করে।

৪। উত্তম কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে ফল, শাক-সবজি এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যে লুকিয়ে থাকা অস্বাস্থ্যকর জীবাণু থেকে দেহকে রক্ষা করতে সহায়তা করে।

৫। উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) বাস্তবায়ন পদ্ধতি

উত্তম কৃষি পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে সংগ্রহ এবং সংগ্রহোত্তর পর্যায়ের প্রত্যেকটি ধাপে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি এবং পরামর্শ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুযায়ী যে সকল ধাপসমূহ অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে তা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. কৃষক/মাঠ কর্মীদের উন্নত কাজের পরিবেশ
২. চাষাবাদের জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন
৩. সঠিক উপায়ে মাটি প্রস্তুত
৪. চাষাবাদের পরিবেশ, চাষ পদ্ধতি এবং ফসল উৎপাদন
৫. পানির গুণাগুণ ও তার যথোপযুক্ত ব্যবহার
৬. সঠিক উপায়ে কীটনাশক/বালাইনাশক এর ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা
৭. সঠিক উপায়ে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা
৮. উত্তম উপায়ে জৈব সার প্রস্তুত, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা
৯. বিভিন্ন প্রকার পশু-পাখির যত্ন
১০. ফসল সংগ্রহকালীন সঠিক ব্যবস্থাপনা
১১. ফসল সংগ্রহোত্তর সঠিক ব্যবস্থাপনা
১২. উৎপাদনের সকল পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ

১. কৃষক/মাঠ কর্মীদের উন্নত কাজের পরিবেশ

১.১. পুরুষ এবং মহিলা কর্মীদের কাজের পরিবেশের মান উন্নয়ন।

- সকল কর্মীদের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতির সাথে নিবন্ধিত হতে হবে।

- কর্মীদের অবশ্যই বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। বিশেষ করে কৃষি কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান,

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

* শিশুদের অবশ্যই স্কুলে পাঠাতে হবে। যদি কাজ করানো হয় তবে তাদের স্বাস্থ্য ও পড়াশুনার যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১.২. পুরুষ এবং মহিলা কর্মীদের বিভিন্ন সেবা নিশ্চিতকরণ।

* প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি
* রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের সময় ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সহায়ক জিনিসপত্র
* পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া
* পরিবারের শিশু এবং বড়দের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজন অনুযায়ী হাসপাতাল কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা।
* নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো এবং নব নিযুক্তদের ক্ষেত্রে হেলথ সার্টিফিকেট পরীক্ষা করা।
* ইমার্জেন্সি ফোন কলের ব্যবস্থা থাকা (ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, হাসপাতাল)।

চিত্র: কৃষি ফার্মে মাঠকর্মীদের বিভিন্ন সেবা

১.৩.মাঠকর্মীদের বিভিন্ন সেবা নিশ্চিতকরণ

- কৃষি ফার্মে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্থায়ী এবং ভ্রাম্যমান টয়লেট এবং ওয়াশরুম থাকা।
- টয়লেট সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকা এবং দরজা সবসময় বন্ধ রাখা। টয়লেটে অবশ্যই টয়লেট পেপার, পর্যাপ্ত পানি, সাবান, তোয়ালে এবং হাত ধোয়ার বেসিনের ব্যবস্থা থাকা উচিত।
- কোনো কর্মী যদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে

তার মাধ্যমে ফ্রেস ফল-মূল ও শাক- সবজি বহন না করানো উত্তম।

❋ হাত মুখ ধৌত করার ক্ষেত্রে যদি পানির ট্যাংকি ব্যবহার করা হয় তাহলে কিছুদিন পরপর ট্যাংকির ভিতরে এবং বাইরে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে, ট্যাংকির পানি অবশ্যই ঠাণ্ডা, পরিষ্কার ও গন্ধবিহীন হতে হবে এবং ট্যাংকিটি গাছ অথবা কোনো কিছুর নিচে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

২. চাষাবাদের জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন

২.৪.স্থান নির্বাচন

❋ যে জমিতে ফসল চাষ করা হবে প্রথমে তার ইতিহাস জানতে হবে। যেমন- জমি যদি ঢালু হয় তাহলে মাটির প্রয়োগকৃত পুষ্টি ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া জমির কাছাকাছি নদী থাকলে সেখানে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জানতে হবে যে জমিতে বিগত বছরগুলোতে বন্যা হয়েছে কি না। বন্যা প্রবণ জমি শাক-সবজি চাষের অনুপযোগী।

❋ জমির আসে পাশে কোন পোল্ট্রি ফার্ম, ডেইরি ফার্ম থাকলে জমিতে জীবাণু প্রবেশ করার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। সেজন্য এরকম ফার্মের কাছাকাছি চাষ করার জন্য জমি নির্ণয় করা ঠিক হবে না।

❋ জমির আসে পাশে কোন পোল্ট্রি ফার্ম, ডেইরি ফার্ম থাকলে জমিতে জীবাণু প্রবেশ করার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। সেজন্য এরকম ফার্মের কাছাকাছি চাষ করার জন্য জমি নির্ণয় করা ঠিক হবে না

❋ চাষাবাদের জন্য স্থান নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন- বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা, মাটি ও জলবায়ুর উপযোগিতা, বাজার সংযোগ এবং শ্রমিক প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তারপর স্থান নির্বাচন করা উচিৎ।

২.৫.জমি নির্বাচন

- চাষের জন্য উর্বর জমি এবং সেচের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

- যে জমি ফসল চাষের জন্য নির্বাচন করা হবে তার বিগত বছরের শষ্য বিন্যাস সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে।
- নির্বাচিত জমিতে আগে কি কি ধরনের রোগবালাই, পোকা-মাকড় এবং আগাছা ইত্যাদির উপস্থিতি ছিল তা সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে।

- জমিতে ফসল চাষের আগে জমির মাটি অবশ্যই পরীক্ষা করে নিতে হবে। পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যাবে জমিতে কি পরিমাণে বিভিন্ন পুষ্টি বিদ্যমান আছে এবং কি পরিমাণ দরকার যেমন- নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি।
- মাটিতে কি পরিমাণ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আছে তাও জানতে হবে যেমন- বোরন, জিংক আয়রন ইত্যাদি।
- মাটিতে দূষণকারী কোন ধাতব পদার্থ আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। যেমন- নিকেল, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক ইত্যাদি। এগুলো যদি বেশি পরিমাণে থাকে তাহলে সেই জমিতে ফসল চাষ না করাই ভালো।

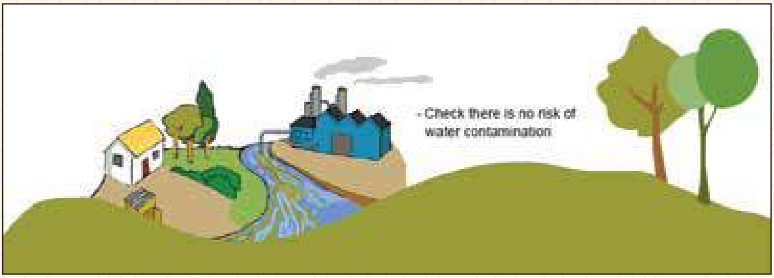

* মাটির পিএইচ জেনে সেই অনুযায়ী নির্ধারিত ফসল চাষ করতে হবে।
* ভালো ফলনের জন্য অবশ্যই মাটিতে জৈব উপাদান এর পরিমাণ কমপক্ষে ২% থাকতে হবে। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখে তারপর জমিতে ফসল চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে অন্যথায় আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে না।
* ফসলি জমি অবশ্যই নোংরা কাগজ, পলিথিন, প্লাষ্টিক এবং খালি কন্টেইনার থেকে মুক্ত রাখতে হবে।
* যে জমিতে ফসল চাষ করা হবে সেই জমি অবশ্যই পশু-পাখি বা মানুষের মল-মূত্র থেকে মুক্ত হতে হবে। তা নাহলে এগুলো গাছের সাথে ও ফল-মূলের সাথে মিশে মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
* গৃহপালিত পশু-পাখি ফসলি মাঠ থেকে দূরে রাখতে হবে।
* ফসলি মাঠের কাছে যেন কোন পায়খানা, নোংরা ডাস্টবিন, নর্দমা না থাকে।
* পানি দূষণের সম্ভাবনা আছে এমন জায়গা চাষের জন্য নির্বাচন করা যাবে না।
* আশপাশের জমি থেকে কি কি ধরনের দূষণ হতে পারে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে।
* উপরোক্ত সকল তথ্য বিবেচনা করে ফসল চাষের জন্য জমি নির্ণয় করতে হবে।

৩. সঠিক উপায়ে মাটি প্রস্তুত ও ব্যবস্থাপনা

- কৃষি বিভাগ এবং কৃষি কর্মকর্তাদের সহায়তায় মাটি পরীক্ষা করে মাটির ধরন ও অন্যান্য গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে হবে।
- জমি তৈরির ক্ষেত্রে উঁচু-নিচু দেখে চাষের জন্য ফসল নির্বাচন করা উচিত।
- জমি চাষের সময় মাটির কম ক্ষতি হয় এমন ভাবে চাষ দেয়া উচিত।
- মাটি যাতে ক্ষয় এবং বেশি শক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- প্রতি বছর ফসল পরিবর্তন করে চাষ করা উচিত
- সবজি ফসল জমিতে রোপণের আগে জমি অবশ্যই কমপক্ষে ৪-৫ বার চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে
- পানির অভাব হয় এমন সময়ে বিশেষ করে শীতকালে বিভিন্ন উপায়ে মালচিং এর ব্যবস্থা করে মাটির ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- বেশি বেশি করে বিভিন্ন প্রকার জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি গুণাগুণ বৃদ্ধি বরতে হবে
- উপরোক্ত সকল কাজের ক্ষেত্রে কৃষি বিষয়ক কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিতে হবে।

৪. চাষাবাদের পরিবেশ, চাষ পদ্ধতি এবং ফসল উৎপাদন

৪.১. ফসল নির্বাচন এবং চাষ

- মাটির অবস্থা বুঝে চাষের জন্য সেই ধরণের ফসল নির্বাচন করা উচিত।
- কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চাষের জন্য ফসলের উন্নতমানের উদ্ভাবিত বীজ যা বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই সহনশীল সেই ধরনের বীজ সংগ্রহ করা উচিত।
- প্রয়োজনে চারা উৎপাদনের আগে বীজ অবশ্যই শোধন করে নিতে হবে।
- খরা, বন্যা এবং রোগবালাইয়ের উপস্থিতির সময় জেনে কৃষি বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে চারা রোপণ করা উচিত।
- কৃষি বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন ফসলের সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব অনুসরণ করে গাছ লাগাতে হবে।
- রোগাক্রান্ত মরা এবং বিক্রিত চারা গাছ চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত নয়।

৪.২. সবজি উৎপাদনে অনুসরণীয় কৌশল

চারা উৎপাদন করে যে সব সবজি ও মসলার চাষ করা হয় তার মধ্যে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, ব্রকলি, বেগুন, টমেটো, মরিচ ও পিঁয়াজ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আগাম শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন সময়ে সবজি চারা উৎপাদন ক্রমশ প্রসার লাভ করছে। উৎকৃষ্ট চারা উৎপাদনের জন্য প্রচুর দক্ষতা এবং নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

৪.২.১. বীজ ও বীজতলা

* যে কোনো ফসল চাষ করার আগে সেই ফসলের সবচেয়ে ভাল জাতের বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
* বীজের মধ্যে মিশ্রণ যেন না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শুধুমাত্র রোগ-জীবাণু মুক্ত, স্পষ্ট এবং চকচকে বীজই চাষের জন্য ব্যবহার করতে হবে।
* বীজতলায় বীজ বপনের পূর্বে প্রোভেক্স অথবা যে কোন ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজের জন্য ২-২.৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

৪.২.২. বীজতলার স্থান নির্বাচন

বীজতলা তৈরির স্থান নির্বাচনের জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন-

* বীজতলার জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু হওয়া প্রয়োজন যাতে বৃষ্টি বা বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশন করা যায়।
* ছায়াবিহীন, পরিষ্কার এবং বাতাস চলাচলের উপযোগী স্থানে বীজতলা করা প্রয়োজন।
* পানির উৎসের কাছাকছি এবং বাড়ী, খামার বা অফিসের কাছাকাছি হওয়া উচিত।
* বীজতলার মাটি বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ এবং উর্বর হওয়া উচিত। বেলে মাটি বেশি হলে কাঁদা মাটি, গোবর বা কম্পোস্ট মিশিয়ে অথবা অতিরিক্ত কাঁদা মাটি উন্নত করা যায়।
* বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন করতে হলে বীজতলা যতদূর সম্ভব ক্রেতাদের কাছাকাছি এবং ভাল যোগাযোগসম্পন্ন স্থানে স্থাপন করা উচিত।

৪.২.৩. বীজতলা তৈরি

- একক বীজতলা বা হাপোর সাধারণত এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার লম্বা হবে। জমির অবস্থা ভেদে দৈর্ঘ্য বাড়ানো কমানো যেতে পারে। প্রয়োজনে বড় জমিকে ভাগ করে এভাবে একাধিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- পাশাপাশি দুটি বীজতলার মধ্যে কমপক্ষে ৬০ সেমি গভীর করে ঝুরঝুরা ও ঢেলা মুক্ত করে তৈরি করতে হবে। বীজতলা সাধারণত ১০-১৫ সেমি উঁচু করে তৈরি করতে হবে।
- মাটি, বালি ও পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হবে। মাটি উর্বর হলে রাসায়নিক সার না দেয়াই ভালো। উর্বরতা কম হলে প্রতি হাপোরে ১০০ গ্রাম টিএসপি সার বীজ বপনের অন্তত এক সপ্তাহ আগে মিশাতে হবে।
- যারা বাণিজ্যিক ভাবে চারা উৎপাদন করেন তাদের জন্য ইট-সিমেন্ট দিয়ে স্থায়ী বীজ তলা তৈরিই শ্রেয়।

৪.২.৪. বীজতলার মাটি শোধন

বীজ বপনের পূর্বে বীজতলার মাটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শোধন করা যায়। এতে অনেক মাটিবাহিত রোগ, পোকামাকড় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দমন করা যায়। যেমন-

- সৌরতাপ ব্যবহার করে।
- জলীয়বাষ্প ব্যবহার করে।
- ধোঁয়া ব্যবহার করে।
- রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে।
- কাঠের গুঁড়া পুড়িয়ে।
- পোল্ট্রি রিফিউজ ব্যবহার করে।

উল্লেখিত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সবচাইতে সহজ ও কার্যকরী পদ্ধতি হলো সৌরতাপ ব্যবহার করে বীজতলার মাটি শোধন করা। এক্ষেত্রে

- বীজ বপনের ১২-১৫ দিন পূর্বে বীজতলার মাটি যথাযথ ভাবে তৈরি করে ভালভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- পরে স্বচ্ছ অথবা রঙ্গিন পলিথিন দিয়ে বায়ু নিরোধক করে ঢেকে রাখতে হবে। এতে সারা দিনের সূর্যালোকে পলিথিনের ভিতরে বীজতলার মাটির তাপমাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে ও অনেকাংশে মাটিবাহিত রোগজীবাণু দমন করবে।
- এছাড়াও অনেক ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও আগাছা দমন হয়।

বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী সবজি চারা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বীজতলায় রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- ফরমালডিহাইড পানিতে মিশিয়ে (৫০ঃ১) ব্যবহার করা হয়।

পোল্ট্রি রিফিউজ ব্যবহার করেও বীজতলায় মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধির সাথে সাথে আংশিক ভাবে বীজতলা মাটি শোধনের প্রক্রিয়া বর্তমানে দেশের অনেক সবজি উৎপাদন এলাকায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.২.৫. বীজ শোধন

বীজতলায় বপনের পূর্বে সবজি বীজ কয়েকটি পদ্ধতিতে শোধন করা যায়। যেমন-

- এগুলোর মধ্যে গুঁড়ো রাসায়নিক ঔষধ দ্বারা বীজ শোধন পদ্ধতি বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত ও কম ঝামেলাপূর্ণ। প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা ক্যাপটান ব্যবহার করে ভালোভাবে ঝাকিয়ে বীজ শোধন করা যায়।
- বীজ শোধনের ফলে বিভিন্ন সবজির এ্যানথ্রাকনোজ, লিফস্পট, বাইট ইত্যাদি রোগ ও বপন পরবর্তী সংক্রমণ রোধ সম্ভব হয়।
- বীজ শোধনকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিষাক্ত বিধায় শোধিত বীজ, শোধন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৪.২.৬. বীজ পরীক্ষাকরণ

শাক সবজির বীজ বপনের পূর্বে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়োজন। ভাল ও বিশুদ্ধ বীজের অভাবে, নির্দিষ্ট জাতের গুণাগুণ সম্পন্ন সবজির উচ্চ ফলন পাওয়া যায় না। বীজের উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে তার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার উপর।

- অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা দেখার জন্য পেট্রিডিশ বা ছোট থালা নিয়ে তার উপর ঐ মাপের চোষ কাগজ পানি দিয়ে ভিজিয়ে ৫০-১০০টি বীজ কয়েক দিন রেখে অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার বের করে নিতে হবে।
- বিভিন্ন সবজির অঙ্কুরোদগম শতকরা সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য হার বিভিন্ন রকম। অঙ্কুরোদগম হার বের করার মাধ্যমে মূল্যবান বীজের সঠিক পরিমাণ, চারার সংখ্যা ইত্যাদি নির্ধারণ করা সহজ হয়।

৪.২.৭. বীজ বপন

- বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম।
- সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪ সেমি) কাঠি দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- ছোট বীজের বেলায় বীজের দ্বিগুন পরিমাণ শুকনো ও পরিষ্কার বালু বা মিহি মাটি বীজের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হবে।
- শুকনা মাটিতে বীজ বপন করে সেচ দেয়া উচিত নয়, এতে মাটিতে চটা বেঁধে চারা গজাতে ও বাতাস চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই সেচ দেয়া মটির 'জো' অবস্থা এলে বীজ বপন করতে হবে।
- যে সমস্ত বীজের আবরণ শক্ত, সহজে পানি প্রবেশ করে না, সেগুলোকে সাধারনত বোনার পূর্বে পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘণ্টা অথবা শতকরা একভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবণে এক রাত্রি ভিজিয়ে বপন করতে হয় (যেমন- লাউ, চিচিংগা, মিষ্টি কুমড়া, করলা, উচ্ছে ও ঝিংগা)।

৪.২.৮. চারা উৎপাদনের বিকল্প পদ্ধতি

- প্রতিকূল আবহাওয়ার বীজতলায় চারা উৎপাদনের জন্য বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে সবজির চারা কাঠের বা প্লাষ্টিকের ট্রে, পলিথিনের ব্যাগে, মাটির টবে, গামলায়, থালায়, কলার খোলে উৎপাদন করা যায়।
- কোন কোন সময় কুমড়া, শিম জাতীয় সবজির চারা রোপণ করা প্রয়োজন দেখা যায়। কিন্তু এসব সবজি রোপণ জনিত আঘাত সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেনা। ছোট আকারের পলিথিনের ব্যাগে বা উপরে উল্লেখিত অন্যান্য মাধ্যমে এদের চারা উৎপাদন করলে সহজে শেকড় ও মাটিসহ চারা রোপণ করা যায়।

৪.৭.৯. বীজতলায় আচ্ছাদন

- আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বীজতলার উপরে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে যেন বৃষ্টির পানি ও অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে বীজতলাকে রক্ষা করা যায়।
- আচ্ছাদন বিভিন্ন ভাবে করা যায়। তবে কম খরচে বাঁশের ফালি করে বীজতলার প্রস্থ বরাবর ৫০ সেমি পরপর পুঁতে নৌকার ছৈ এর আকার তৈরি করে বৃষ্টির সময় পলিথিন দিয়ে এবং প্রখর রোদে চাটাই দিয়ে বীজতলার চারা রক্ষা করা যায়।

৪.৭.১০. চারার যত্ন

- চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দিয়ে অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন।
- পানি সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যা তবে বীজতলার মাটি দীর্ঘ সময় বেশি ভেজা থাকলে অঙ্কুরিত চারা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

* চারার শিকড় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে রোদ কোন ক্ষতি করতে পারে না, তখন এটি বরং উপকারী।
* চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর বীজতলায় প্রয়োজনমত দূরত্ব ও পরিমাণে চারা রেখে অতিরিক্ত চারাগুলি যত্ন সহকারে উঠিয়ে দ্বিতীয় বীজতলায় সারি করে রোপণ করলে মূল্যবান বীজের সাশ্রয় হবে।

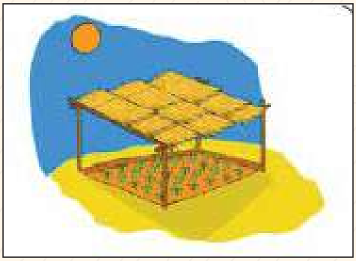

৪.২.১১. দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তরকরণ

* জমিতে চারা লাগানোর পূর্বে মূল বীজতলা থেকে তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় সবজি চারা রোপণের পদ্ধতি অনেক দেশেই চালু আছে। এ পদ্ধতিকে সবজি চারার দ্বিতীয় স্থানান্তরকরণ পদ্ধতি বলে।
* দেখা গেছে ১০-১২ দিনের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করা হলে কপি গোত্রের সবজি, বেগুন ও টমেটো চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত হয়, চারা অধিক সবল ও তেজী হয়।
* চারা উঠানোর আগে বীজতলায় পানি দিয়ে এরপর সূচালো কাঠি দিয়ে শিকড়সহ চারা উঠাতে হয়। উঠানো চারা সাথে সাথে দ্বিতীয় বীজতলায় লাগাতে হয়।
* বাঁশের সূচালো কাঠি বা কাঠের তৈরি সূচালো ফ্রেম দিয়ে সমান দূরত্ব সরু গর্ত করে চারা গাছ লাগানো হয়।
* লাগানোর পর হালকা পানি দিতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ও প্রখর রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন বা চাটাই দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৪.২.১২. বীজতলার চারার রোগ দমন

- বীজতলায় বপনকৃত বীজ গজানোর পূর্বে এবং পরে রোগাক্রান্ত হতে পারে।
- অঙ্কুরোদগমরত বীজ আক্রান্ত হলে তা থেকে আদৌ চারা গজায় না।
- গজানোর পর রোগের আক্রমণ হলে চারার কাণ্ড মাটি সংলগ্ন স্থানে পচে গিয়ে নেতিয়ে পড়ে।
- একটু বড় হওয়ার পর আক্রান্ত হলে চারা সাধারণত মরে না, কিন্ত এদের শিকড় দুর্বল হয়ে যায়। চারা এভাবে নষ্ট হওয়াকে ড্যাম্পিং অফ বলে। বিভিন্ন ছত্রাক এর জন্য দায়ী। ড্যাম্পিং অফ রোগ বাংলাদেশে চারা উৎপাদনের একটি বড় সমস্যা। বীজতলার মাটি সব সময় ভেজা থাকলে এবং মাটিতে বাতাস চলাচলের ব্যাঘাত হলে এ রোগ বেশি হয়।
- এজন্য বীজতলার মাটি সুনিষ্কাশিত রাখা রোগ দমনের প্রধান উপায়। প্রতিষেধক হিসেবে মাটিতে ক্যাপটান, কপার অক্সিক্লোরাইড বা ডায়থেন এম-৪৫ দুই গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভালকরে ভিজিয়ে কয়েকদিন পর বীজ বপন করতে হবে।
- এছাড়াও কাঠের গুঁড়া পুড়িয়ে, সৌরতার, পোল্ট্রি রিফিউজ ও খৈল ব্যবহার করেও ড্যাম্পিং অফ থেকে চারাকে রক্ষা করা যায়।

৪.৭.১৩. চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বর্ধন

- রোপণের পর মাঠের প্রতিকূল পরিবেশ যেমন ঠাণ্ডা আবহাওয়া বা উচ্চতাপমাত্রা, পানির স্বল্পতা, শুষ্ক বাতাস এবং রোপণের ধকল ও রোপণকালীন সময়ে চারায় সৃষ্ট ক্ষত ইত্যাদি যাতে সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে সেজন্য বীজতলায় থাকাকালীন চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা হয়।
- যে কোন উপায়ে চারার বৃদ্ধি সাময়িকভাবে কমিয়ে যেমন বীজতলায় ক্রমান্বয়ে পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে বা দুই সেচের মাঝে সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে চারাকে কষ্ট সহিষ্ণ করে তোলা যায়।
- কষ্ট সহিষ্ণুতা বর্ধনকালে চারার শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট) জমা হয় এবং রোপণের পর এই স্বেতসার দ্রুত নূতন শিকড় উৎপাদনে সহায়তা করে। ফলে সহজেই চারা রোপণজনিত আঘাত সয়ে উঠতে পারে।

৪.৭.১৪. চারা রোপণ

- ✻ বীজতলায় বীজ বপনের নির্দিষ্ট দিন পর চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। সবজির প্রকার ভেদে চারার বয়স ভিন্নতর হবে।
- ✻ কপি জাতীয় সবজি, টমেটো, মরিচ, বেগুন ইত্যাদির চারা ৩০-৪০ দিন বয়সে রোপণ করতে হয়।
- ✻ চারা উঠানোর পূর্বে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। যত্ন করে যতদূর সম্ভব শিকড় ও কিছু মাটিসহ চারা উঠাতে হবে।
- ✻ মূল জমিতে চারা লাগানোর পরপরই গোড়ায় পানি দিতে হবে এবং কয়েকদিন পর্যন্ত নিয়মিত সেচ দিতে হবে।
- ✻ চারা সাধারণত বিকাল বেলায় লাগানো উচিত।

সবজি	চারার বয়স (দিন)	সবজি	চারার বয়স (দিন)
ফুলকপি	৩০-৩৫	টমেটো	৩০-৩৫
বাঁধাকপি	৩০-৩৫	বেগুন	৪০-৫০
ওলকপি	৩০-৩৫	পেঁয়াজ	৫০-৬০
লেটুস	৩০-৪০	পালংশাক	৩০-৪০
বীট	৩০-৪০	মরিচ	৪০-৫০

৪.৭.১৫. ভাল চারার বৈশিষ্ট্য

- ✻ চারা স্বাভাবিক আকারের অর্থাৎ বেশি বড় বা ছোট হবে না।
- ✻ কমপক্ষে ৫/৬টি পাতা যুক্ত থাকতে হবে।
- ✻ শিকড় অক্ষত ও মাটির দলায় জড়ানো থাকতে হবে।
- ✻ রোগের সবরকম লক্ষণ থেকে মুক্ত হতে হবে।
- ✻ মজবুত কাণ্ড ও সতেজ চেহারা থাকতে হবে।
- ✻ স্বাভাবিক সবুজ পাতা থাকতে হবে (অত্যাধিক গাঢ় সবুজ চারায় নাইট্রোজেনের আধিক্য থাকায় চারা দুর্বল হয়)।

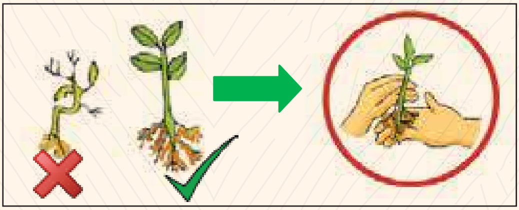

৪.২.১৬. রোপণ দূরত্ব

সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক দূরত্বে চারা রোপণের ওপর ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ভর করে। সঠিক দূরত্ব বজায় না রাখলে কাঙ্খিত ফল কখনো পাওয়া যায় না। জাত ভেদে একই প্রজাতির ফলে রোপণ দূরত্ব ভিন্ন হ'তে পারে।

বিভিন্ন প্রকার শাক সবজির বপনের সময় ও দূরত্ব

শস্যের নাম	জীবনকাল (দিন)	বীজের পরিমাণ/ শতক	বপনের সময়	বপন দূরত্ব
বেগুন	১৮০-২০০	০.৫ গ্রাম	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	১০০ সে.মি. x ৭০ সে.মি.
টমেটো	১২০-১৫০	১.০ গ্রাম	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মে-জুলাই (গ্রীষ্মকালীন)	৬০ x ৪০ সে.মি.
মিষ্টি মরিচ	১২০-১৪০	১.০ গ্রাম	অক্টোবর-নভেম্বর	৪৫ x ৪৫ সে.মি.
ফুলকপি	৮০-১২০	১.০ গ্রাম	আগস্ট -অক্টোবর	৬০ x ৪৫ সে.মি.
বাঁধাকপি	৮০-১২০	১.৫ গ্রাম	আগস্ট -অক্টোবর	৬০ x ৪৫ সে.মি.
মূলা	আগাম জাতঃ ৪৫-৬০ নাবী জাতঃ ৭০-৭৫	১০ গ্রাম	আগাম - সেপ্টেম্বর উপযুক্ত- অক্টোবর নাবী : নভেম্বর-ডিসেম্বর বীজের জন্য: মধ্য নভেম্বর	৪৫ x ৩০ সে.মি.
মিষ্টি কুমড়া	১৬০-১৯০	২০-২৫ গ্রাম	অক্টোবর-ডিসেম্বর ফেব্রুয়ারি-মে (গ্রীষ্মকালীন) বীজের জন্য: মধ্য নভেম্বর	১.৮ x ২.০ মি.
করলা	১২০-১৪০	২৫-৩০ গ্রাম	ফেব্রুয়ারি-মে	১.৫ x ১.৫ মি.
চাল কুমড়া	৭০-৭৫	১৫-২০ গ্রাম	ফেব্রুয়ারি-মে	১.৮ x ২.০ মি.
শসা	৭৫-১২০	১৫-২০ গ্রাম ১-১.৫ গ্রাম (পলিব্যাগ)	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	১.৬ x ১.৫ মি.
ঝিঙা	১২০-১৪০	১২-১৫ গ্রাম	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	১.৮ x ২.০ মি.
চিচিঙা	প্রায় ১৫০	১৬-২০ গ্রাম	ফেব্রুয়ারি-জুন	১.৫ x ১.৫ মি.
তরমুজ	৯০-১০০	৬-৮ গ্রাম	মধ্য ফেব্রুয়ারি নভেম্বর-মধ্য জানুয়ারি	১.৫ x ১.৫ মি.
পটল	৯০-৯৫	কাটিং	অক্টোবর-মার্চ	১.৫ x ১.০ মি.

৪.৩. ফল চাষে অনুসরণীয় কৌশল

৪.৩.১. জমি

ফলগাছ যেহেতু বহুবর্ষজীবী সেজন্য এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেন পানি না উঠে। উঁচু, রোদ ও সুনিষ্কাশনযুক্ত এবং পানির উৎসের কাছাকাছি হতে হবে।

৪.৩.২. চারা/কলম নির্বাচন

পরীক্ষামূলকভাবে বাগান স্থাপনের ক্ষেত্রে সঠিক চারা/কলম নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চারা নির্বাচন সঠিক না হলে বাগান থেকে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে না। চারার বয়স, রোগ বালাইয়ের আক্রমণ, সতেজতা প্রভৃতি বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ এগুলো গাছের ফলন ক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ভাল চারা/কলমের নিম্নলিখিত গুণাগুণ থাকবে-

- চারা/কলমটি হবে ভাল জাত ও অনুমোদিত উৎসের সায়ন বা বীজ থেকে উৎপন্ন
- চারা/কলমটির কাণ্ডের দৈর্ঘ্য শিকড়ের দৈর্ঘ্যের ৪ গুনের বেশি হবে না
- চারা/কলমের বয়স এক বা দেড় বছরের বেশি হবে না
- চারা/কলমে ফুল/মুকুল বা ফল থাকবে না
- চারাটি রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ মুক্ত হবে
- কলমের চারাটি হবে ২-৩টি সুস্থ-সবল শাখাযুক্ত
- জোড় কলমের চারার আদিজোড় এবং উপজোড়ের মধ্যে সংগতি থাকতে হবে এবং সঠিকভাবে জোড়া লাগতে হবে।

সারণী ১ : বাংলাদেশের বিভিন্ন ফলের উৎপাদন এলাকা ও সম্ভাবনাময় এলাকা

ফলের নাম	বর্তমান উৎপাদন এলাকা	সম্ভাবনাময় এলাকা
আম	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, যশোর, ঠাকুরগাঁও, সাতক্ষীরা	পাবনা, রংপুর, টাঙ্গাইল, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নীলফামারী, পঞ্চগড়
কলা	নরসিংদী, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বরিশাল, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, যশোর, কুষ্টিয়া	যশোর, দিনাজপুর, রাজশাহী
কাঁঠাল	ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, রংপুর, বি-বাড়িয়া	দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, পাবনা, যশোর, নরসিংদী

ফলের নাম	বর্তমান উৎপাদন এলাকা	সম্ভাবনাময় এলাকা
আনারস	টাঙ্গাইল, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার	চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, পঞ্চগড়, গাজীপুর, নরসিংদী
পেঁপে	রাজশাহী, পাবনা, নাটোর, যশোর, নরসিংদী	দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, নোয়াখালী, সিলেট, রংপুর, ঢাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম
পেয়ারা	বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, গাজীপুর, বি-বাড়িয়া	কুমিল্লা, পাবনা, সিলেট, নরসিংদী
লিচু	দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, রংপুর, গাজীপুর, ঢাকা, নাটোর	ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বি-বাড়িয়া
কমলা	সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ
লেবু	সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, রংপুর, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার	কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ, পাবনা
বাতাবীলেবু	সিলেট, রংপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী, পাবনা, মৌলভীবাজার	গাজীপুর, টাঙ্গাইল, খুলনা
কুল	খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, যশোর, সাতক্ষীরা, নওগাঁ, বগুড়া	রংপুর, ঢাকা, গাজীপুর, সিলেট, পাবনা
সফেদা	বরিশাল, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সাতক্ষীরা	গাজীপুর, যশোর
নারিকেল	খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, যশোর, ফরিদপুর	কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজশাহী
আমড়া	বরিশাল, সাতক্ষীরা	চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নোয়াখালী, খুলনা

৪.৩.৩. চারা রোপণের সময়

মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস বেশির ভাগ ফলদ বৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে সেচ সুবিধা থাকলে টবে বা পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা/কলম বছরের যে কোন সময় রোপণ করা চলে। শীতকাল খরার সময় গাছ লাগালে এর প্রতি অধিক যত্নশীল হতে হবে। নতুবা রোপিত চারা/কলমের মৃত্যু হার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪.৩.৪. চারা/কলম সংগ্রহ

ফলের চারা/কলম অবশ্যই নির্ভরযোগ্য উৎস হ'তে সংগ্রহ করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন বিএআরআই, ডিএই, বিএডিসি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন ব্র্যাক, প্রশিকা এবং বেশ কিছু ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারী যেমন- পঞ্চগড় নার্সারী, আজাদ নার্সারী, শাহ নার্সারী প্রভৃতি গুণগত মানসম্পন্ন এবং সঠিক জাতের চারা/কলম সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও আইসি-এএফআইপি কর্মসূচির আওতাধীন নার্সারি মালিক সমিতির সদস্যগণের নার্সারি হতেও চারা/কলম সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৪.৮.৫. ফিল্ড লে-আউট

ফলদ বৃক্ষ বহুবর্ষজীবী এবং বৃহদাকার হওয়ায় ফিল্ড লে-আউট ও চারা রোপণে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। প্রথমে রেজিস্টারে চারা রোপণের নকশা তৈরি করতে হবে। সাধারণত সমভূমিতে বর্গাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টোর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

৪.৮.৬. জাত বিন্যাস

বাণিজ্যিক ফলবাগানে জাত বিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক উন্নত জাতসমূহের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান। গাছের আকার, ফুল/ফল ধারণ সময়, ফল আহরণ সময়, রোগালাই ও পোকামাকড় সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নত জাতে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রোপণ দূরত্ব, ফসল ও বালাই ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করতে হয়। সে জন্য জাত অনুযায়ী বাগানকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে নিয়ে চারা রোপণ করা হলে বাগান ব্যবস্থাপনার কাজ সহজ হবে।

৪.৩.৭. রোপণ দূরত্ব

সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক দূরত্বে চারা রোপণের ওপর ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ভর করে। সঠিক দূরত্ব বজায় না রাখলে কাঙ্খিত ফল কখনো পাওয়া যায় না। গর্তের মাঝখানে চারা সোজাভাবে লাগাতে হবে ও চারদিকে মাটি চেপে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর গোড়ায় ও পাতায় পানি দিতে হবে। তারপর কয়েকদিন পর্যন্ত দু-একদিন পর পর সেচ দিলে চারা সহজে টিকে যাবে। জাত ভেদে একই প্রজাতির ফলে রোপণ দূরত্ব ভিন্ন হতে পারে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের ফল গাছের রোপণ দুরত্ব এবং চাষের এলাকা

জাত	রোপণ দূরত্ব	এলাকা
বারি আম-১, ২, ৬, ৭	১০ মি. x ১০ মি.	রাজশাহীসহ দেশের অন্যান্য এলাকা
বারি আম-৫	১০ মি. x ১০ মি.	দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল
বারি আম-৩, ৪, ৮	৮ মি. x ৮ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি লিচু-১	১০ মি. x ১০ মি.	রাজশাহী ও পাবনা
বারি লিচু-২, ৩	৮ মি. x ৮ মি.	দেশের উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব অঞ্চল

জাত	রোপণ দূরত্ব	এলাকা
বারি লিচু-৪	৮ মি. x ৮ মি.	দিনাজপুর, রংপুর
বারি কুল-১,২ আপেলকুল	৫ মি. x ৫ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি কুল-৩, বাউকুল-১, ২	৪ মি. x ৪ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি পেয়ারা-২	৫ মি. x ৫ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি নারিকেল-১, ২	৬ মি. x ৬ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি কমলা-১	৩ মি. x ৩ মি.	দেশের উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব অঞ্চল
বারি লেবু-১	৩ মি. x ৩ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি লেবু-২, ৩	২.৫ মি. x ২.৫ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি বাতাবীলেবু-৩, ৪	৬ মি. x ৬ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি মাল্টা-১	৪ মি. x ৪ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি আমড়া-১	৪ মি. x ৪ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি আমড়া-২	৭ মি. x ৭ মি.	উপকূলীয় অঞ্চল
বারি কাঁঠাল-১, ২	১০ মি. x ১০ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি সফেদা-১, ২, ৩	৭ মি. x ৭ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি জামরুল-১	৫ মি. x ৫ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি আঁশফল-২	৫ মি. x ৫ মি.	সমগ্র বাংলাদেশ
বারি তেঁতুল-১	৮ মি. x ৮ মি.	দেশের পূর্ব অঞ্চল

৪.৩.৮. মাদা তৈরি

জাতভেদে গর্তের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা ভিন্ন হবে। তবে গর্তের আকার বড় হলে প্রাথমিক পরিচর্যায় সুবিধে হয়, জৈব সার বেশি ব্যবহার করা যায় ও পরবর্তীতে চারা সতেজ ও সবল হয়ে উঠে। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্ত চিহ্নিতকরণ খুঁটিকে কেন্দ্র করে মাদা তৈরি করতে হবে। বড় ও মাঝারি বৃক্ষের জন্য ১ মি. x ১ মি. x ১ মি. এবং ছোট বৃক্ষের জন্য ৬০ সে.মি. x ৬০ সে.মি. x ৬০ সে.মি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে।

৪.৩.৯. খুঁটি ও বেড়া দিয়ে চারা রক্ষা

চারা রোপণের পরপরই যে কাজটি করতে হয় তাহলো রোপণকৃত চারাটিকে শক্ত একটি খুঁটির সাথে সামান্য ঢিলে করে বেঁধে দেয়া। আমাদের দেশে ছোট চারা ছাগল, ভেড়া-গবাদিপশু আক্রমণ করে থাকে। তাই রোপণের পরপরই চারাকে খাঁচা দিয়ে ঘের বেড়া দিতে হবে। অন্তত দুই বছর বা মানুষের উচ্চতা সমান না হওয়া পর্যন্ত চারা রক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৪.৩.১০. চারা বা কলম রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

০১. চারার গোড়ায় পানি দেয়া এবং অতিরিক্ত পানি সরিয়ে ফেলা;
০২. মাটি আলগা করা এবং প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি দেয়া;
০৩. আগাছা পরিষ্কার করা;
০৪. আক্রান্ত বা মরা চারা তুলে নতুন চারা লাগানো।

৪.৩.১১. আগাছা পরিষ্কার

আগাছা ফলগাছের ক্ষতি করে থাকে। খাবারে ভাগ বসানো ছাড়াও আগাছা পোকা ও রোগের আশ্রয় হিসেবে কাজ করে। এজন্য বছরে ৩ থেকে ৪ বার আগাছা পরিষ্কার করা উচিত। আগাছা পরিষ্কারের পর আগাছা বা লতাপাতা-খড়কুটো দিয়ে ফল গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হবে। এতে গাছের গোড়ার রস সংরক্ষণে সহায়ক হবে এবং পচে জৈব সার হিসেবে গাছের কাজে লাগবে।

৪.৩.১২. সার ও পানি ব্যবস্থাপনা

চারা রোপণের আগে গর্তে সার প্রয়োগ করতে হয়। চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে প্রতি বছর সারের পরিমাণ ১০ শতাংশ হারে বাড়াতে হয়। ফলন্ত গাছে বছরে দুই বার সার দেয়া দরকার। একবার বর্ষার আগে আরেকবার বর্ষার পরে সুষম সার দেয়া ভালো। সুষম সার অবশ্যই জৈব এবং অজৈব সারের সমন্বয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভরদুপুরে একটি গাছের ছায়া যতটুকু মাটিতে পড়ে ততটুকু জায়গায় শিকড় বিস্তৃত হয়, পারতপক্ষে ওই জায়গাটুকুতে সার প্রয়োগ করতে পারলেই সারের কার্যকারিতা বাড়ে ও ফলন বেশি হয়। বড় গাছের গোড়া থেকে ১ মিটার দূরে সার দেয়া উচিত। সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। খরার সময় সেচ দেয়া গাছের জন্য উপকারী। কোনো কোনো গাছে (যেমন- আম, লিচু) মুকুল আসার আগে পানি দেয়া উচিত নয়। পানি দিলে মুকুল আসার পরিবর্তে নতুন পাতা গজায়। এসব গাছে বর্ষার পরে আর পানি না দিয়ে ফলের গুটি আসার পর পানি দেয়া উচিত। ফল ধরার সময় সেচ দিলে ফল ঝরা কমে আসে ও ফলের আকার বড় হয়। কিন্তু কাঁঠাল গাছে মুচি আসার পূর্বে পানি দিতে হয় ও মুচি আসার পর পানি দেয়া বন্ধ করতে হয়।

৪.৩.১৩. অঙ্গ ছাঁটাই

অঙ্গ ছাঁটাই ফলগাছ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। এতে গাছের আকার যেমন সুন্দর হয় তেমনি ফলনও বেশি হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে রোপণের দুই বছরের মধ্যে পার্শ্বশাখা কেটে দেয়া, চিকন, নরম, রোগা বা দুর্বল শাখা সিকেচার দিয়ে নিয়মিত কেটে রাখলে গাছ রোগমুক্ত থাকে ও ফলন বেশি হয়। তাছাড়া মৌসুমি ফল গাছ থেকে ফল সংগ্রহ শেষে ফলের বোঁটা, ছোট শাখা প্রশাখা ও মরা ডাল কেটে দিলে পরের মৌসুমে নতুন শাখা-প্রশাখা, পাতা জন্মায়। এতে গাছ নীরোগ থাকে, ফলন বেশি হয়।

৪.৩.১৪. রোগবালাই দমন

ফল গাছের জীবনকালে বিভিন্ন রকমের রোগ ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এতে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুলফল ধারণে ব্যাঘাত ঘটে এবং ফলনে অনাকাঙ্খিত প্রভাব পড়ে। অসংখ্য পোকা এবং রোগের আক্রমণ গাছের শুরু থেকে শেষ অবধি অব্যাহত থাকে। তবে পরিচ্ছন্ন ও পরিকল্পিত চাষাবাদ করলে আক্রমণের প্রাদুর্ভাব কম হয়। রোগ ও পোকা থেকে ফলগাছকে সুরক্ষার জন্য যেসব কার্যক্রম অনুসরণ করা যেতে পারে তা হলো-

- ভালো জাতের সুস্থ সবল নীরোগ চারা-কলম রোপণ;
- সুষম সার ব্যবস্থাপনা;
- আগাছা পরিষ্কার ও অন্যান্য পরিচর্যা এবং সেচ বা নিকাশ;
- শীতের পর বাগান চাষ দেয়া;
- গাছের অপ্রয়োজনীয় অংশ (অবাঞ্ছিত শাখা বা নতুন শাখা) ছাঁটাই ও পরিস্কারকরণ;
- প্রয়োজনে ভেষজ-জৈব কীটনাশক পরিমিত ব্যবহার কেননা এগুলো ব্যবহার করা নিরাপদ;
- সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক পরিমাণে সঠিকভাবে ব্যবহার।

৫. পানির গুণাগুণ ও তার যথোপযুক্ত ব্যবহার

৫.১. সেচ অথবা অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত পানির সঠিক ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা:

- কৃষি বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত সময় ও পদ্ধতিতে ফসলের জমিতে সেচ দিতে হবে।
- যে পুকুরের পানিতে গরু, ছাগল বা অন্যান্য গৃহপালিত পশুকে গোসল বা পরিষ্কার করানো হয় সেই পুকুরের পানি ফসলের মাঠে দেওয়া যাবে না।

- যে পানির উৎসের সাথে কল-কারখানার বর্জ্য অথবা পায়খানার সংযোগ আছে তা ব্যবহার করা যাবে না।
- টিউবওয়েল অথবা ডিপ মেশিন এর মাধ্যমে সেচ দেওয়া উচিৎ।
- ফসলের মাঠে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পানি দেয়া যাবে না।
- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষ করা উচিৎ।
- পানির উৎস থেকে গৃহপালিত পশু দূরে রাখতে হবে।
- পনির উৎসর কাছে কীটনাশক অথবা বালাইনাশক স্প্রে করা উচিৎ নয়।
- ফসলের প্রয়োজন মোতাবেক সেচ দিলে অধিক ফলন পাওয়া যায়।
- বছরে কমপক্ষে একবার ফসলের মাঠে দেয়া সেচের পানি পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ এতে রোগ জীবাণু আছে কি নেই।
- সেচের উৎস থেকে মাঠ পর্যন্ত সেচ নালা বিভিন্ন মলমূত্র এবং আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখতে হবে।
- পানির ট্যাঙ্কি/পানির আধার এবং সেচ নালা অবশ্যই পুশ-পাখির বিচরণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। যদি পানি দূষিত হয় তাহলে পরিবারের সদস্যরা এবং মাঠ কর্মীরা অসুস্থ হতে পারে। আর যদি ফল মূল বা শাক-সবজি জীবাণু দ্বারা দূষিত হয় তাহলে বাজারে কম দামে বিক্রি করতে হবে এমনকি বিক্রি নাও হতে পারে।
- প্রত্যেক ফসলের পানির চাহিদা সম্পর্কে জানতে হবে এবং অত্যাধিক পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- অনিয়ন্ত্রিত সেচ ফসলের গুণগত মান নষ্ট করে দিতে পারে
- সর্বোপরি একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

৫.২. মাঠকর্মী এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যবহৃত পানি:

- খাওয়া, গোসল এবং হাত মুখ ধৌত করার কাজে অবশ্যই বোতল বন্দী পানি/টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করতে হবে।
- খোলা কন্টেইনারে পানি রাখা যাবে না। যাতে মশা মাছি বংশ বৃদ্ধি করতে পারে এবং অন্যান্য প্রাণির মাধ্যমে দূষিত হতে পারে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- যদি বোতল বন্দী পানি ব্যবহার করা সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই ক্লোরিন শোধিত পানি অথবা ফুটন্ত পানি ব্যবহার করতে হবে।

৬. সঠিক উপায়ে কীটনাশক/বালাইনাশক এর ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

৬.১. কীটনাশক ও বালাইনাশক এর যথোপযুক্ত ব্যবহার

- প্রথমে জানতে হবে কি ধরনের আগাছা, পোকা-মাকড় অথবা রোগ বালাই দ্বারা ফসল আক্রান্ত হয়েছে
- বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে রাসায়নিক/কীটনাশক/বালাইনাশক এর পরিবর্তে জৈবিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কি না।
- বিভিন্ন রোগবালাই ও কীটপতঙ্গ জৈব উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ এতে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে না। যেমন : নীম বীজ, সেক্স ফেরোমন ট্রাপ, ইয়েলো ট্রাপ, বিষ টোপ ফাঁদ, আলোর ফাঁদ, ট্রাইকো কম্পোস্ট লিচেট ইত্যাদি।
- ফসল বিভিন্ন রকম আগাছা, কীটপতঙ্গ এবং রোগ বালাই দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে, ফসল অনুসারে কোন ধরনের আগাছানাশক, কীটনাশক এবং বালাইনাশক অনুমোদিত আছে তা কৃষি বিশেষজ্ঞ এর কাছে পরামর্শ নিয়ে প্রয়োগ করতে হবে
- যে কীটনাশক/বালাইনাশক ব্যবহার করা হবে তা অবশ্যই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে
- মেয়াদোত্তীর্ন কীটনাশক/বালাইনাশক কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক অথবা কোন বিশ্বস্ত কৃষি বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শ অনুযায়ী নির্দেশিত মাত্রায়, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কীটনাশক অথবা বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- নির্দিষ্ট পরিমাণের তুলনায় বেশি প্রয়োগ ফসল, পরিবেশ ও স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর।
- রোগক্রান্ত, মরা, দুর্বল চারা গাছ তুলে গর্তে পুঁতে ফলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে তারপর স্প্রে করতে হবে।
- নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করতে হবে এবং রোগ বালাই দেখা দিলে দ্রুত তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- প্রত্যেকবার স্প্রে করার সময় নির্দিষ্ট বিরতি অনুসরণ করতে হবে। যেমন বলা হয় ৩ বার স্প্রে করতে হবে ১০-১৫ দিন অন্তর
- কীটনাশক/বালাইনাশক স্প্রে করার ঠিক পর পর মাঠে প্রবেশ করা যাবে না।
- প্রত্যেক বার স্প্রে করার সময় কীটনাশক/বালাইনাশক এর নাম,

পরিমাণ, মাত্রা, পদ্ধতি প্রয়োগকৃত ফসলের নাম, রোগের নাম, প্রয়োগের তারিখ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

- মনে রাখতে হবে- কীটনাশক/বালাইনাশক নির্দেশিত মাত্রায় বোতল বন্দি পানি অথবা টিউবয়েলের জীবাণুমুক্ত পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৬.২. স্প্রে করার সময় করনীয়

- কীটনাশক/বালাইনাশক প্রয়োগের স্থান হতে শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের অবশ্যই দূরে রাখতে হবে।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লম্বা হাতার শার্ট অথবা গেঞ্জি, লম্বা পায়জামা/প্যান্ট/ট্রাউজার, হাতের গ্লাভস, চোখে চশমা, পায়ে জুতা এবং নাকে মুখের মাস্ক পরে অবশ্যই কীটনাশক/বালাইনাশক স্প্রে করতে হবে।
- স্প্রে মেশিনের বিভিন্ন জয়েন্ট প্রথমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোথাও কোন সমস্যা আছে কিনা।
- ঈস্প্রয়ার ট্যাংকির ভিতর এবং বাহিরে ভালো করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে।

- প্রথমে শুধু পানি দিয়ে ট্যাংকি ভরে স্প্রে করে দেখতে হবে যে নজলে কোন সমস্যা আছে কিনা এবং সমানভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় পানির বিন্দুগুলো পড়ছে কিনা।
- বাতাসের বিপরীতে সামনের দিকে স্প্রে করা যাবে না। সবসময় মৃদু বাতাসে নিচের দিকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে সমান তালে স্প্রে করতে হবে।
- বৃষ্টি আসবে আসবে ভাব এমন সময় এবং বৃষ্টির ঠিক পর পর কীটনাশক/বালাইনাশক স্প্রে করা ঠিক নয়।
- স্প্রে করার পর পরিহিত সকল যন্ত্র ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধৌত করতে হবে।

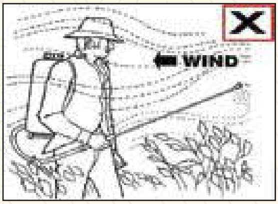

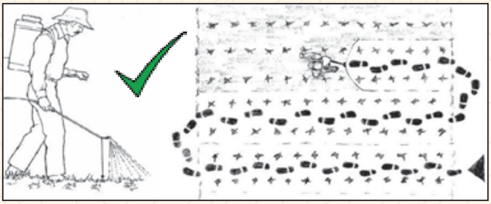

❋ পরিবারের অন্যান্য কাপড় এবং স্প্রে করার সময় পরিহিত কাপড় আলাদা আলাদা ভাবে ধৌত করা উচিৎ।

❋ প্রতিবার স্প্রে করার পর উপর থেকে নিচের দিকে পানি দিয়ে ভালোভাবে সাবান দিয়ে গোছল করতে হবে।

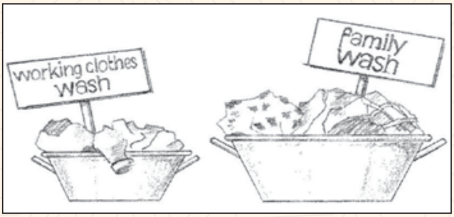

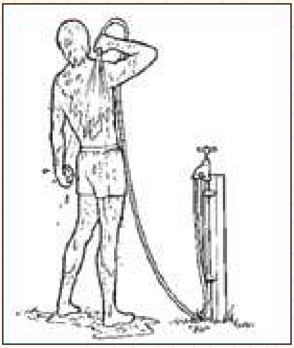

৬.৩. রাসায়নিক দ্রব্যাদি (কীটনাশক/বালাইনাশক) সংরক্ষণের নিয়ম

❋ মাঠের পাশে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একটি বিশেষ ঘরের/অবকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

❋ অল্প পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য কাঠের অথবা স্টিলের বক্স তৈরি করা যেতে পারে।

❋ যেখানে শিশু এবং পশু-পাখি ঢুকতে পারবেনা এমন জায়গায় রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

❋ রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংরক্ষণাগারে অবশ্যই সবসময় তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে এবং ঘরের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বাতাস চলাচল করতে পারে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে

❋ সংরক্ষণাগার অবশ্যই ঠাণ্ডা জায়গায় করতে হবে। যাতে রাসায়নিক দ্রব্যাদির গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে।

❋ বিভিন্ন পোস্টারের মাধ্যমে সংকেত সাবধান করতে হবে যেমন- বিষাক্ত

দ্রব্য, ধরা নিষেধ, ধূমপান নিষেধ, খাওয়া যাবে না, পান করা যাবে না ইত্যাদি।

* কীটনাশক/বালাইনাশক অবশ্যই, বীজ, সংগৃহীত ফসল, পশু পাখির খাবার এবং সার ইত্যাদি থেকে আলাদা রাখতে হবে|

৭. সঠিক উপায়ে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

৭.১. রাসায়নিক সার ব্যবহার

* জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পূর্বে মটি পরীক্ষা করা উত্তম। মাটিতে পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতি বুঝে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।
* অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার বর্জন করতে হবে।
* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অথবা সার ব্যবস্থাপনা গাইডের নির্দেশিত মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলে বিভিন্ন মাত্রা ও পদ্ধতি মোতাবেক সার প্রয়োগ করতে হবে।

৭.২. রাসায়নিক সার সংরক্ষণের নিয়ম

* মাঠের পাশে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একটি বিশেষ ঘরের/অবকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে রাসায়নিক সার সংরক্ষণ করা হবে।
* অল্প পরিমাণ রাসায়নিক সার সংরক্ষণের জন্য কাঠের অথবা স্টিলের বক্স তৈরি করা যেতে পারে।
* যেখানে শিশু এবং পশু-পাখি ঢুকতে পারবেনা এমন জায়গায় রাসায়নিক সার সংরক্ষণ করতে হবে।
* রাসায়নিক সার সংরক্ষণাগারে অবশ্যই সবসময় তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে এবং ঘরের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বাতাস চলাচল করতে পারে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে

* সংরক্ষণাগার অবশ্যই ঠাণ্ডা জায়গায় করতে হবে। যাতে রাসায়নিক সারের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে।
* বিভিন্ন পোস্টারের মাধ্যমে সাবধান করতে হবে যেমন- বিষাক্ত দ্রব্য, ধরা নিষেধ, ধূমপান নিষেধ, খাওয়া যাবে না, পান করা যাবে না ইত্যাদি।
* রাসায়নিক সার অবশ্যই, বীজ, সংগৃহীত ফসল, পশু পাখির খাবার এবং কীটনাশক/বালাইনাশক ইত্যাদি থেকে আলাদা রাখতে হবে।

৮. উত্তম উপায়ে জৈব সার প্রস্তুত, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

৮.১. জৈব সার ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

* প্রথমে জানতে হবে যে জমিতে পশু-পাখি অথবা গাছগাছালি কোন ধরনের জৈব সার ফসলের জমির জন্য ভালো
* মনে রাখতে হবে যে, জৈব সারের ভুল ব্যবহারই দূষণের অন্যতম মূল কারণ
* জৈব সার অবশ্যই ভালোভাবে পচনের পর ব্যবহার করতে হবে কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না।
* যে কোন জৈব সার ব্যবহারের কমপক্ষে ১৫-২০ দিন পর জমিতে চারা লাগানো উচিৎ।

* খোলা রৌদ্রোজ্জ্বল জায়গায় জৈবসার স্তূপ করে রাখা ঠিক না জাতে এর গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে। স্তূপ করে তার উপরে ছাউনী দিলে গুণাগুণ বজায় থাকে।
* গোবরের পাশাপাশি, কেঁচো সার, মুরগির বিষ্ঠা এবং ট্রাইকো-কম্পোস্ট জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম।
* মুরগির বিষ্ঠা এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট ব্যবহারের মাধ্যমে মাটিবাহিত রোগ দমন করা সম্ভব।
* জৈব সার প্রয়োগের বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে

৮.২. কোথায় জৈব সার তৈরি করবো

* জৈব সার অবশ্যই ফসলি জমি থেকে দূরে আলাদা জায়গায় প্রস্তুত করতে হবে
* বন্যা হয় এমন জায়গা এবং পানির আধার থেকে দূরে জৈব সার প্রস্তুত করতে হবে।

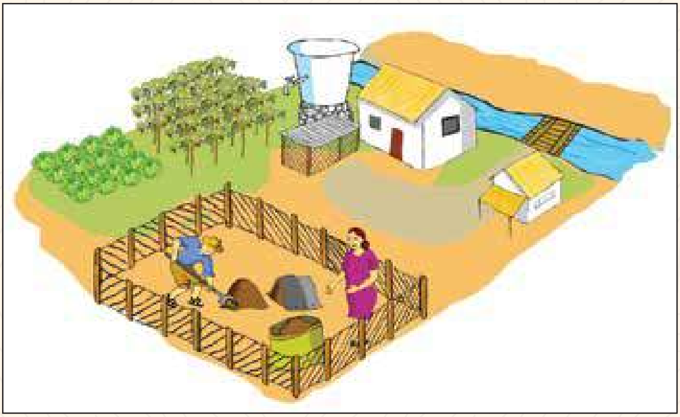

৯. বিভিন্ন প্রকার পশু-পাখির যত্ন

৯.১. কাজে ব্যবহৃত পশু

* কাজের জন্য নিয়োজিত পশুদের নিয়মিত বিশেষজ্ঞ দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে এবং স্বাস্থ্যবান পশু দ্বারাই শুধু কাজ করানো যাবে
* যখন তাদের কাজে নিয়োজিত করা হবে না তখন অবশ্যই ফসলের মাঠ থেকে দূরে কোথাও ভালো জায়গায় বিশ্রামের জন্য রাখতে হবে।

৯.২. উৎপাদন এর জন্য নিয়োজিত পশু

- তাদের বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে হবে যেমন- থাকার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পর্যাপ্ত খাবার, জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানি ইত্যাদি।

৯.৩. গৃহপালিত পশু

- গৃহপালিত পশু (কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি) অবশ্যই ফসলি জমি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও বালাইনাশক যেখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে তার থেকে দূরে রাখতে হবে।
- ফসলি জমি অবশ্যই সাইনবোর্ড দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে এবং সকল মাঠকর্মীদের অবশ্যই জানতে হবে যে গৃহপালিত পশু যেন কোনভাবে ফসলি জমিতে প্রবেশ না কের।

১০. ফসল সংগ্রহকালীন সঠিক ব্যবস্থাপনা সঠিক সময় এবং সঠিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ

- বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহ করতে হবে।
- অতিরিক্ত পরিপক্কতা বাজার দর কমিয়ে দিতে পারে।

* খুব ভোরে ফসল সংগ্রহ করা উচিত এতে ফসলের গুণাগুণ নষ্ট হয় না এবং দেখতে তরতাজা দেখা যায়।
* অতিরিক্ত তাপমাত্রায় অর্থাৎ দুপুর বেলায় ফসল সংগ্রহ করা উচিত নয় এতে ফসলের সজীবতা নষ্ট হয়ে যায়।
* বিভিন্ন ফসলের পরিপক্কতা নির্দেশ সূচক জেনে সংগ্রহ করা উচিত।

* খালি হাতে টান দিয়ে কখনই ফসল সংগ্রহ করা উচিত নয়।
* হাতে রাবারের গ্লাভ্স পরে সিকেচার/ব্লেড দিয়ে ফলের বোঁটার ১/২ ইঞ্চি পরিমাণ রেখে কর্তন করা উচিত। এতে গাছের কোন ক্ষতি হবে না এবং রোগ জীবাণু প্রবেশ করতে পারবে না।
* ফসল অবশ্যই প্লাস্টিকের ক্রেট অথবা বাঁশের ঝুড়িতে সংগ্রহ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই মাটির উপর রাখা যাবে না।
* প্লাস্টিকের ক্রেট অথবা বাঁশের ঝুড়ি ফসল সংগ্রহ করার আগে এবং পরে অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
* ফসল সংগ্রহ করার আগে মাঠ কর্মীদের অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান এবং সাবান দিয়ে হাত ভালো করে ধৌত করে নিতে হবে।
* ফলের ক্ষেত্রে মাটিতে পড়ে ফেটে যাওয়া, কাদা লাগা ফল বাজারজাত করণের জন্য সংগ্রহ করা যাবে না।
* ফসল সংগ্রহের জন্য অবশ্যই সারের বস্তা অথবা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্যাকেট ব্যবহার করা যাবে না।
* ফসল বিশেষ করে ফলমূল এবং শাক-সবজি সংগ্রহ করার পরপর বড় গাছের

নিচে অথবা কৃত্রিম উপায়ে পলিথিন দিয়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে তৈরি ছাউনীর নিচে ছায়া জায়গায় রাখতে হবে।

- সংগ্রহের পরপর ফলগুলি পরিষ্কার ঠাণ্ডা টিউবওয়েলের পানি দিয়ে অথবা ক্লোরিন পানি দিয়ে ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে এবং ছায়াতে শুকাতে হবে।
- সংগ্রহের পর সুস্থ, রোগাক্রান্ত, বিকৃত ইত্যাদি ভাগে ফলগুলো যত্ন সহকারে বিভক্ত করতে হবে।
- সুস্থ ও সুন্দর ফলগুলি পরবর্তীতে ছোট, বড় এবং মাঝারি এই তিন ভাগে বাছাই করতে হবে তারপর আলাদা আলাদা ভাবে মোড়কজাত করতে হবে।
- উপরোক্ত সকল কাজের ক্ষেত্রে মাঠ কর্মীদের হাতে গ্লাভ্স পরতে হবে।

সবজির পরিপক্কতা সূচক ও সংগ্রহ পদ্ধতি

ফসল সংগ্রহের সময় পরিপক্কতা ফল বা সবজির সংগ্রহোত্তর মানের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে থাকে। অপরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করলে ফসলের সংগ্রহোত্তর মান খারাপ হয়ে যায় কিংবা কুচকে যায়। আবার অতি পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করলে ফসলের "সেল্ফ লাইফ" (Shelf Life) কমে যায়। আবার ত্রুটিপূর্ণ ভাবে সংগ্রহ করলে ফসল আঘাতপ্রাপ্ত হয় কিংবা থেতলিয়ে বা ফেটে যায়। এ কারণে ফসল তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ফসল সংগ্রহকরণ ও পরবর্তী কালে ব্যবস্থাপনার সময় কোন রকম ক্ষত হলে ফসল থেকে পানির অপচয় হয়, এজন্য ফসলের কচকচে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষত স্থান দিয়ে রোগজীবাণু প্রবেশ করে যা ফসলকে পচিয়ে দেয়। ফসল সংগ্রহের সময় অতি সাবধানে সংগ্রহ করতে হয়। নিম্নে ফল ও সবজি সংগ্রহ সূচকের উদাহরণ দেওয়া হলো -

টেবিল ১. প্রচলিত ফলসমূহের পরিপক্কতার সূচক

ফলের নাম	পরিপক্কতার সূচক
আম	(ক) আমের বোঁটার কাছে সামান্য রং আসা (খ) প্রাকৃতিকভাবে গাছ থেকে দু'একটি পাকা আম মাটিতে পড়া (গ) পরিপক্কতার সময়কাল যা আমের জাত এবং অনুকূল আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। আম সাধারণত ফল ধরার পর থেকে ৯০-১২০ দিনের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করে।
কাঁঠাল	পরিপক্ক ফলের গায়ের কাঁটা চ্যাপ্টা হয়ে কাঁটার অগ্রভাগ কাল রঙ ধারণ করে। তাছাড়া ফলের গায়ে আঘাত করলে যদি ড্যাব ড্যাব শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে কাঁঠাল পরিপক্ক হয়েছে। সাধারণত গাছে ফল ধরার ১২০-১৫০ দিনের মধ্যে কাঁঠাল পরিপক্কতা লাভ করে। বীজ শক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কচি কাঁঠাল সবজি হিসাবে খাওয়ার জন্য সংগ্রহ করা যায়।

ফলের নাম	পরিপক্কতার সূচক
পেঁপে	সবজি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ফলে কষ যখন হালকা তরল হয়ে আসে তখন পেঁপে সংগ্রহ করা উত্তম। অন্যদিকে ফলের রঙ যখন গাঢ় সবুজ থেকে হালকা সবুজ অথবা সবুজ রঙ হারিয়ে ফলের পিছন দিকে হালকা হলুদ রঙের আবির্ভাব হলেই বুঝতে হবে ফল সংগ্রহের সময় হয়েছে। দূরবর্তী স্থানে পরিবহণের জন্য ফল গাঢ় সবুজ থেকে হালকা সবুজ অথবা এক-চতুর্থাংশ হলুদ রঙ ধারণ করলে সংগ্রহ করা উচিত।
কলা	ঋতুভেদে রোপণের ১০-১৩ মাসের মধ্যে সাধারণত সব জাতের কলা পরিপক্ক হয়ে থাকে। কলার খোসার কৌনিক শিরাগুলি যখন প্রায় সমান হয়ে যায় অর্থাৎ শিরাগুলি তিন-চতুর্থাংশ বিলুপ্ত হয় তখন কলার পরিপক্কতা আসে। তাছাড়া কলার অগ্রভাগের পুস্পাংশ শুকিয়ে গেলেই বুঝতে হবে কলা পুষ্ট হয়েছে।
আনারস	আনারস স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের জন্য পরিপূর্ণভাবে পরিপক্ক অর্থাৎ হলুদ রঙ ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হবে এবং দূরবর্তী বাজারে বিক্রয়ের জন্য সম্পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় হালকা হলুদ রঙ ধারণ করলে সংগ্রহ করা উত্তম।
লিচু	সাধারণত গাছে ফল আসার ৫৫-৬০ দিন পরে ফল সংগ্রহ উপযোগী হয়ে থাকে। কিন্তু এটা জাত ও পরিবেশের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ফল পাকার সময় খোসা আকর্ষণীয় খয়েরী, লাল বা সবুজ মিশ্রিত লাল রঙ ধারণ করে এবং খোসার কাঁটাগুলি চ্যাপ্টা হয়ে সমান হয়ে যায়।
পেয়ারা	পেয়ারা পরিপক্কতার সময় গাঢ় সবুজ থেকে আস্তে আস্তে হলদে সবুজ রঙ ধারণ করে।
কুল	গাছে ফুল আসার পর ৪-৫ মাসের মাথায় কুল পরিপক্কতা লাভ করে। কুলের শাঁস যখন নরম হয় এবং জাতভেদে রঙ যখন হালকা হলুদ বা সোনালী হয় তখন কুল সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
নারিকেল	ফুল ফোঁটার ১১-১২ মাস পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ডাব হিসেবে খাওয়ার জন্য ৫-৭ মাস বয়সী ফল সংগ্রহ করা হয়। নারিকেল পরিপক্ক হলে বাদামী রঙ ধারণ করে এবং ঝাঁকি দিলে পানির উপস্থিতি টের পাওয়া যায়।
লেবু	ফলের ত্বক তুলনামূলকভাবে মসৃণ ও ফলের রঙ কিছুটা হালকা হয়ে আসলে ফল সংগ্রহ করতে হবে।

টেবিল ২. প্রধান সবজি সমূহের পরিপক্কতার সূচক

সবজি ফসল	সংগ্রহ সূচক
মূলা, গাজর	আকার, শিকড়ের দৈর্ঘ্য, সতেজতা।
আলু, পিঁয়াজ, রসুন, হলুদ	গাছের পাতার ওপরের অংশের শুকানো এবং নুইয়ে পড়া অবস্থা দেখে।
শাকালু, আদা	আকার।

সবজি ফসল	সংগ্রহ সূচক
পাতা পিঁয়াজ	পাতার আকার এবং দৈর্ঘ্য।
মটরশুঁটি, বরবটি, ফেলন, শিম, চারকোণা শিম, লিমাবিন	পুষ্ট শুঁটি এবং চাপে সহজেই ভেঙ্গে যায়।
ঢেঁড়শ	আকার এবং অপরিপক্ক। অগ্রভাগ আঙ্গুলের চাপে সহজেই ভেঙ্গে যায়।
চালকুমড়া, ঝিঙ্গা, লাউ	কাঙ্খিত আকার এবং রঙ দেখে নির্ধারণ করা হয়। নখ সহজেই চামড়ার গায়ে প্রবেশ করে।
বেগুন, করলা, শশা	কাঙ্খিত আকার অথচ অপরিপক্ক।
টমেটো	যখন ফল কাটা হয় তখন বীজ পিছলে যায় অথবা সবুজ রঙ যখন গোলাপী রঙ ধারণ করে।
মিঠা মরিচ	গাঢ় সবুজ বর্ণ যখন হালকা হয়ে যায় অথবা লাল বর্ণ ধারণ করে।
বাঙ্গি	যখন হালকা সবুজ বর্ণ সাদা থেকে ঘিয়া বর্ণ ধারণ করে: অনুভূতযোগ্য সুগন্ধ
তরমুজ	গোড়ার দিকে হালকা ঘিয়া বর্ণ ধারণ করে এবং চাপড় দিলে ফাঁপা শব্দ হবে।
ফুলকপি	পুস্প গুচ্ছের আকার এবং আঁটসাট গঠন।
ব্রোকলি	কুড়ি মঞ্জুরি আটসাট গঠন।
লেটুস	ফুল আসার পূর্বে কাঙ্খিত আকার।
বাঁধাকপি, পালংশাক, লালশাক, ডাঁটাশাক, সবুজশাক	আকার দেখে সংগ্রহ করা হয়, আঁশ হওয়ার পূর্বে এবং সতেজ ভাব গাঢ় সবুজ বর্ণ থাকা অবস্থায়।

১১. ফসল সংগ্রহোত্তর সঠিক ব্যবস্থাপনা

সংগ্রহোত্তর কলাকৌশল হল সংগ্রহ থেকে ভক্ষণ করার পূর্ব পর্যন্ত ফসল নাড়াচাড়াসহ কিছু ব্যবস্থাপনা এবং কৌশলাদি যার মাধ্যমে ফসলের গুণগতমান রক্ষা করা সম্ভব হয়। তাজা পণ্যের গুণগতমান বজায় রাখা, তাদের সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো এবং তুলনামূলক অপচয় কমানোর জন্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহৃত হয়। ভোক্তার নিকট আকর্ষণীয়ভাবে পণ্য উপস্থাপনের জন্য সংগ্রহোত্তর কলাকৌশল প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তমভাবে সংগ্রহোত্তর কার্যাদি সম্পাদনে অনেকগুলি ধাপ রয়েছে যা সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

১১.১. প্যাকহাউজ স্থাপন

বাণিজ্যিকভাবে উত্তম কৃষি পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে মাঠের পাশে একটি প্যাকহাউজ স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। ফল বা সবজির সব ধরনের সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি প্যাকহাউজ এর গুরুত্ব অপরিসীম।

একটি প্যাকহাউজের অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে -

- যতদুর সম্ভব এটি যাতে কৃষি খামারের কাছাকাছি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে
- পণ্য এবং পণ্যের প্যাকেটগুলো পরিবহণে উঠানো ও নামানোর সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে
- বাজার এবং পরিবহণ টার্মিনালে যাতে সহজেই প্রবেশ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১১.২. প্যাকহাউজের স্থান ও ব্যবহৃত ঘরের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলো হলো

- ভাল রাস্তা থাকতে হবে
- অণুজীব দ্বারা সংক্রমণের ঝুঁকিমুক্ত হতে হবে
- রৌদ্র ও বৃষ্টি থেকে রক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে
- প্রয়োজনীয় পানি ও বিদ্যুত এর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে
- পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে
- প্যাকহাউজের কর্মীদের আরামদায়ক ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে

ফসল উৎপাদনের এলাকা, উৎপাদনের পরিমাণ, ফসলের গুণগতমান, বাজারে পণ্যের চাহিদা এবং নির্ধারিত বাজার ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নথিভূক্ত করতে হবে এবং উৎপাদন ও বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই সে সম্পর্কে জানতে হবে

১১.৩. প্যাকহাউজের কার্যাবলী

- প্যাকহাউজের কার্যক্রমের মাধ্যমে সবজি/পণ্যের সাথে মূল্য সংযোজন করা যায়।
- প্যাকহাউজের কার্যক্রম নির্ভর করে মূলত পণ্য ও বাজারের প্রকৃতির উপর। ফলজাতীয় সবজির জন্য যে সকল কার্যক্রমের প্রয়োজন হয়,

পাতা জাতীয় সবজির জন্য তা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যেমন কিছু ফসলের প্যাকহাউজ কার্যাবলি নিম্নে দেয়া হলো-

- **টমেটো, বেগুন, মরিচ, শসা, করলা ও বরবটির জন্য ধারাবাহিক প্যাকহাউজ কার্যক্রম-** পণ্য গ্রহণ- সর্টিং- পরিষ্কারকরণ- ত্বকের পানি শুকানো- গ্রেডিং- প্যাকেজিং- সংরক্ষণ- বহির্গমন ও বাজারজাতকরণ।
- **প্যাকহাউজে ফুলকপির কার্যক্রম-** পণ্য গ্রহণ- সর্টিং- ছাঁটাইকরণ বা ট্রিমিং - প্যাকেজিং- সংরক্ষণ- বহির্গমন ও বাজারজাতকরণ।
- **প্যাকহাউজে বাঁধাকপি ও চাইনিজ কপির জন্য কার্যক্রম-** পণ্য গ্রহণ- সর্টিং- ছাঁটাইকরণ- ব্যাকটেরিয়াল নরম পচা রোগ দমন- ত্বকের পানি শুকানো- গ্রেডিং- প্যাকেজিং- সংরক্ষণ- বহির্গমন ও বাজারজাতকরণ।
- **প্যাকহাউজে সরিষা পাতা সবজির জন্য কার্যক্রম-** পণ্য গ্রহণ- সর্টিং/গ্রেডিং-পরিষ্কার ও ছাঁটাইকরণ- ত্বকের পানি শুকানো- প্যাকেজিং- সংরক্ষণ- বহির্গমন ও বাজারজাতকরণ।

- নিকটস্থ বাজারে সরবরাহের জন্য কেবলমাত্র বাছাইকরণ ও প্যাকেজিং এর প্রয়োজন হয়, কিন্তু দূরবর্তী বাজারের জন্য আরো অতিরিক্ত কিছু সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। এছাড়া যে সকল সবজি বা পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে পরিবহণ করা হবে সেগুলো সংরক্ষণাগারে রাখার প্রয়োজন হয় না।
- মূলত একটি সাধারণ প্যাকহাউজে ফসলের সংগ্রহোত্তর যে সকল ব্যবস্থাপনা কর্যক্রম গ্রহণ করা হয় তা হলো-

১. ফল ও সবজি / পণ্য গ্রহণ
২. সর্টিং অথবা বাছাইকরণ
৩. পণ্য ঠাণ্ডাকরণ
৪. গ্রেডিং অথবা শ্রেণিকরণ
৫. পরিষ্কারকরণ
৬. প্যাকেজিং
৭. পরিবহন ও বাজারজাতকরণ
৮. সংরক্ষণ

১১.৩.১. সবজি বা পণ্য গ্রহণ

- প্যাকহাউজে সবজি আসার পর জাত এবং উৎপাদনের স্থানসহ ওজন নথিবদ্ধ করা।

- সবজি বাজারজাতকরণের জন্য বিশেষ করে উন্নত বাজারে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নথি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- পণ্যের নমুনা সংগ্রহ করে উপযুক্ত মেশিনের সাহায্যে বালাইনাশকের উপস্থিতির মাত্রা পরীক্ষা করে জানা প্রয়োজন।
- বাজারজাতকরণের সময় পণ্যের লেভেলিং এ নমুনা পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখ করলে উন্নত মার্কেটে পণ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে।
- বিভিন্ন সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে পণ্যকে সূর্যের আলো ও তাপ থেকে দূরে রাখতে হবে, বড় প্যাকেজিং এর কারণে শারীরিক ক্ষত এবং মাটি ও আবর্জনা ইত্যাদির সংস্পর্শ হতে রক্ষা করতে হবে যাতে জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হতে না পারে।
- পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রথমেই বিভিন্ন ক্ষতযুক্ত (রোগ-পোকাক্রান্ত, শারীরিক ক্ষত) পণ্যগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে করে পরবর্তীতে পণ্যের সর্টিং ও গ্রেডিং করতে সুবিধা হয়।

১১.৩.২. সর্টিং অথবা বাছাইকরণ

- সর্টিং কার্যক্রমের মাধ্যমে পণ্যে ৪০-৬০% মূল্য সংযোজন করা সম্ভব।
- সর্টিং এর মাধ্যমে নিম্নলিখিতভাবে সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো যায়-

  ক) রোগের সংক্রমণ হতে সুস্থ্য পণ্যকে পৃথক রাখা সম্ভব।

  খ) ক্ষতযুক্ত ও পাকা ফলের সহিত ভাল ফল/সবজি রাখলে উৎপাদিত ইথিলিনের দ্বারা ভাল সবজিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে সর্টিং ও গ্রেডিং এর মাধ্যমে পণ্যের শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন ও শারীরিক ক্ষতের পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়।

- সংগ্রহের পর অতিরিক্ত পাকা, কাটা ও ফাটা, ত্রুটিপূর্ণ বা অন্যভাবে আঘাতপ্রাপ্ত, পরিপক্ক ও অপরিপক্ক ফসল বাছাই করে নিতে হয়। নতুবা সঠিক বাজার মূল্য পাওয়া যায় না।

১১.৩.২. পণ্য ঠাণ্ডাকরণ

- ফসল সংগ্রহ করার সাথে সাথে মাঠের কাছে কৃত্রিম ছাউনি তৈরি করে অথবা জমির পাশে বড় গাছের নিচে ফসল রাখতে হবে, এতে ফসলের আন্তঃতাপমাত্রা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।
- প্যকহাউজে ফসল সর্টিং করার পরের কাজ হচ্ছে ফসল ঠাণ্ডাকরণ। স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানিতে বরফ কুচি মিশিয়ে তারপর এতে সবজি রাখলে

সবজির আন্তঃতাপমাত্রা লক্ষ্যণীয়ভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। গবেষণায় দেখা গেছে, এভাবে ঠাণ্ডা করলে সবজির আন্তঃতাপমাত্রা প্রায় ১৩-১৭ ডিগ্রি পর্যন্ত নামিয়ে আনা যায়।

- ঠাণ্ডাকরণের মাধ্যমে শ্বসনের হার কমিয়ে আনা যায় এবং ফল ও সবজির জীবনকাল বেড়ে যায় ।

১১.৩.৩. গ্রেডিং অথবা শ্রেণিকরণ

- গ্রেডিং স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে পণ্য বাণিজ্যের বিশ্বজনীন প্রতীক। গ্রেডের মান অনুযায়ী বাজারে পণ্যের চাহিদা নির্ধারিত হয় এবং সেই অনুযায়ী প্যাকহাউজের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- সটিংকৃত পণ্যসমূহ নির্দিষ্ট আকার, ওজন ও পরিপক্কতার উপর ভিত্তি করে গ্রেডিং বা শ্রেণিকরণ করা হয়। সটিং এর পরে বা প্যাকেজিং এর ঠিক পূর্বে গ্রেডিং করা প্রয়োজন।

১১.৩.৫. পরিষ্কারকরণ

- বাজারে উচ্চ মূল্য পাওয়ার জন্য সবজি বা পণ্য পরিষ্কার করতে হবে।
- পরিষ্কার করার মাধ্যমে সবজিতে জীবাণুর সংক্রমণ, শারীরিক ক্ষত এবং পরিবহণ খরচ হ্রাস করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে সবজি বা পণ্য পরিষ্কার করতে হবে

- বেগুন ও টমেটোর বোঁটা, সরিষা পাতার মূল, ফুলকপি ও বাঁধাকপির পাতা ও বাড়তি শিকড় ছাঁটাই করতে হবে। বাঁধাকপির ক্ষেত্রে ৩-৪টি মোড়ানো পাতা রাখতে হবে।
- পরিষ্কার নরম কাপড় দিয়ে টমেটো, বেগুন বা শসা মুছে নিতে হবে।
- পরিষ্কার পানি দিয়ে পণ্যের সাথে লেগে থাকা মাটি ও অন্যান্য আবর্জনা ধৌত করতে হবে।
- পরিষ্কারকরণের সময় সটিং এর কাজও করা যায়।
- পণ্য যেন কোনভাবেই সরাসরি মাটির সংস্পর্শে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, মাটি হলো বিভিন্ন জীবাণুর অন্যতম উৎস, যার সংস্পর্শে রোগের সৃষ্টি হয়।

১১.৩.৬. প্যাকেজিং এর পূর্বে সবজি শোধন

ক) স্যানিটাইজারের ব্যবহার

* ১০০-২০০ পিপিএম ক্লোরিন মিশ্রিত পানিতে (৪-৮ টেবিল চামচ বাণিজ্যিক ব্লিচিং পাউডার যাতে ৫.২৫% NaOCL থাকে তা প্রায় ৪ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১-৩ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে টমেটোসহ বিভিন্ন সবজির পচন কমে যায়। শোধনের পর সবজির ত্বকের পানি শুকিয়ে তারপর প্যাকেটজাত করতে হবে।

খ) ক্যালসিনেটেড ক্যালসিয়াম ব্যবহার করে

গবেষণায় দেখা গেছে ফসলের মধ্যে উপস্থিত জৈব যৌগের সাথে ক্লোরিন বিক্রিয়া করে ট্রাইহ্যালোমিথেন তৈরি করে, যা উচ্চমাত্রার ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ হিসাবে কাজ করে। এজন্য নন-ক্লোরিন স্যানিটাইজার হিসেবে বর্তমানে স্ক্যালপ পাউডার (Scallop Powder) হতে তৈরিকৃত ক্যালসিনেটেড ক্যালসিয়াম ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১ গ্রাম ক্যালসিনেটেড ক্যালসিয়াম মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করার পর তাতে সতেজ সবজি বা ফলকে ৩-৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এতে করে সবজি বা ফলের ত্বকের উপর উপস্থিত অণুজীবের সংখ্যা কাঙ্খিত মাত্রায় কমে আসবে।

১১.৩.৭. প্যাকেজিং অথবা পণ্যের মোড়কিকরণ

* প্যাকহাউজের প্রধান কাজ হল পণ্যকে প্যাকেজিং করা। যা সতেজ পণ্যকে ক্ষত হওয়া ও বাহিরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। দুর্বল ও অনুপোযুক্ত প্যাকেজিং ব্যবস্থার কারণে পণ্য গন্তব্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে পরিবহণ ও হ্যান্ডিলিং এর সময় সবচেয়ে বেশি সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হয়।
* বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজিং দ্রব্য বা কন্টেইনার পাওয়া যায়। ফসলের প্রকৃতি, বাজারের দূরত্ব, যানবাহনের ধরণ এবং রাস্তার অবস্থার উপর নির্ভর করে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল কেমন হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।
* সতেজ সবজি বা ফল পরিবহণের ক্ষেত্রে প্যাকেজিং এর জন্য কাঠের বাক্স বা প্লাস্টিক ক্রেটস-ই অধিকতর উপযোগী। তবে এই পাত্রসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাইনার হিসেবে মুদ্রণবিহীন নিউজ পেপার, পরিষ্কার কলার পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

ক) সবজির উত্তম প্যাকেজিং-এর জন্য আবশ্যিক কার্যক্রম

* সবজি প্যাকেজিং এর জন্য পরিষ্কার পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

- যদি যান্ত্রিকভাবে সবজির প্যাকেট হ্যান্ডিলিং এর ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে একক প্যাকেটের ওজন ৪০ কেজির নিচে হতে হবে, যাতে করে একজন শ্রমিক একাই একটি প্যাকেট সহজে তুলতে বা নামাতে পারে।
- পাত্রের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী সবজি ভরতে হবে। কারণ ধারণ ক্ষমতার বেশি হলে সবজিতে চাপজনিত ক্ষত সৃষ্টি হবে। আবার পরিমাণ কম হলে কম্পনজনিত (ভাইব্রেশন) ক্ষত সৃষ্টি হবে।
- একটি পাত্রে কেবলমাত্র একই ধরনের পরিপক্কতা বিশিষ্ট সবজি বা পণ্য রাখতে হবে।
- প্যাকেজিং পাত্রে পণ্যকে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে নড়াচড়া করতে না পারে।
- সবজি ভরার সময় পাত্রকে মৃদুভাবে নড়াচড়া করতে হবে যাতে করে পাত্রের ভিতরের ফাঁকা স্থান পণ্য দ্বারা পূর্ণ হয়।
- প্যাকেজিং এর পর পাত্রকে সঠিকভাবে বেঁধে দিতে হবে।
- অতঃপর প্যাকেটকৃত সবজি বাজারজাতকরণের পূর্বে শীতল স্থানে রাখতে হবে।

খ) মডিফাইড অ্যাটমসফিয়ার প্যাকেজিং (MAP)

- ম্যাপ হচ্ছে এমন একটি প্যাকেজিং প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পণ্যকে পলিব্যাগের মধ্যে রেখে সীলিং (Sealing) করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পলিব্যাগের ভিতরে নিম্নমাত্রায় অক্সিজেন (O_2), উচ্চমাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস ও উচ্চমাত্রায় আর্দ্রতা বিরাজ করে। এই অবস্থায় পণ্যের শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়া হ্রাস পায় এবং পানির অপচয় কমে যায়। ফলে ফসলের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়।
- ম্যাপ প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত বাণিজ্যিক পলিথিন ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ২৫ মাইক্রোন পুরু পলিথিন (০০১ লেভেল) ব্যবহার করা উচিত। এর চেয়ে বেশি পুরু পলিথিন ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এতে পণ্য পচে যেতে পারে।
- বক্স প্যাকেজিং ও সংরক্ষণাগারেও ম্যাপ ব্যবহার করা যায়।

১১.৩.৮. পরিবহন

- পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত গাড়ির অবশ্যই লাইসেন্স থাকতে হবে এবং চালকেরও ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

* যে সকল কর্মীরা মালামাল গাড়িতে উঠানো নামানোর কাজে অংশগ্রহণ করবে তাদের অবশ্যই জীবাণুমুক্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়ম অনুসরণ করতে হবে

* পরিবহণের সময় অবশ্যই ফসলের ধরন, ফসলের পরিমাণ, তারিখ, ফসল উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা, এবং পরিবহণ চালকের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং নিয়মিত এর রেকর্ড রাখতে হবে।
* সবজি পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিবহনকারী যান পরিবহনের পূর্বে এবং পরে নিয়মিত পাম্প এর পানির মাধ্যমে ভালোভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
* খেয়াল রাখতে হবে যানবাহন এর ভিতরে যেন ইঁদুর, তেলাপোকা, পিঁপড়া ইত্যাদি না থাকে এবং কোন প্রকার মলমূত্র বা অন্য কিছুর খারাপ গন্ধ না থাকে।
* খোলা ভ্যানে পরিবহন করলে উপরে অবশ্যই ছাউনি থাকতে হবে। তা না হলে বৃষ্টির পানি, রোগ বালাই ও ধুলাবালি দ্বারা ফসলের গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে।
* একই পরিবহনে সবজি বা ফলমূলের সাথে অন্য কোন দ্রব্যাদি যেমন- রাসায়নিক সার, কীটনাশক/ বালাইনাশকের প্যাকেট ইত্যাদি যেন পরিবহন না করা হয় সে দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

* পরিবহনের সময় সবজি বা ফলমূলের বস্তা বা ক্রেট এর উপর বসে অথবা দাঁড়িয়ে ভ্রমণ করা যাবে না। পরিবহণ যানে পণ্যদি উঠানো নামানোর সময় যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা এবং সুষ্ঠভাবে হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা
* পণ্য সামগ্রী খুব শক্ত করে বাঁধা যাতে তা নড়াচড়া করতে না পারে এবং পরিবহণ যানের জায়গা সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
* পণ্যের প্যাকেটগুলি এমনভাবে সাজানো যাতে নিচের পণ্য সামগ্রীর কোন ক্ষতি না হয়;
* গাড়ি চালককে যত্নের সাথে গাড়ি চালাতে হবে যাতে পণ্যে তেমন ঝাকুনি না লাগে;
* পরিবহণকালে অবাধ বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকতে হবে যাতে বাইরের আলো-বাতাস পণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং পণ্যের শ্বসনজনিত গ্যাস ইথাইলিন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি সহজেই বের হয়ে যেতে পারে।
* তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত কাভার্ড ভ্যানে সবজি ও ফলমূল পরিবহনের সর্বোত্তম পন্থা।

১১.৩.৯. ফসল সংরক্ষণ

ক) নির্বাচিত ফল ও সবজির সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ফল ও সবজির গুণগত মান রক্ষা ও সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধে সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফল ও সবজি যে সব কারণে সংরক্ষণ করা হয় বা সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়, তা সাধারণত নিম্নরূপ

* মাঠ থেকে সংগ্রহের পর বাজারজাতকরণের পূর্বে ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে
* খুচরা বাজারে সরবরাহের আগে সাময়িক সংরক্ষণের জন্য

- বৈদেশিক বাজারে রপ্তানির পূর্বে গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে
- পচন থেকে রক্ষা করে প্রয়োজনমত ভবিষ্যতে বা অমৌসুমে বিক্রি বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

খ) সংরক্ষণাগার এর পরিচর্যা

- সংরক্ষণাগার অবশ্যই ময়লা ও রোগ জীবাণুমুক্ত, শুষ্ক এবং বাতাস চলাচলের সুবিধাযুক্ত ঠাণ্ডা জায়গা হতে হবে।
- মেঝের উপর ফসল রাখা যাবে না। ফল ও শাক-সবজি ক্রেটের মাধ্যমে মেঝে থেকে ১ ফুট উপরে তাকের মধ্যে সাজিয়ে স্টোর করতে হবে। এতে করে সংগ্রহোত্তর রোগ বালাই বা কীট পতঙ্গ থেকে ফসলকে অনেকাংশে রক্ষা করা যাবে।
- উত্তম গুণাগুণ সম্পন্ন পণ্য সংরক্ষণ করা;
- ক্ষতযুক্ত বা রোগজীবাণু যুক্ত পণ্যকে সংরক্ষণ না করা;
- সংরক্ষণের আগে পণ্যকে অবশ্যই প্রাক শীতলীকরণ করা;
- যে পাত্রে পণ্য সংরক্ষণ করা হবে সেই পাত্রটির মধ্য দিয়ে যাতে সহজে বায়ু চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা রাখা;
- দুইটি সংরক্ষণ পাত্রের মধ্যে অবশ্যই কিছু ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে;
- যখন বিভিন্ন ধরনের পণ্য একসঙ্গে সংরক্ষণ করা হবে তখন লক্ষ্য রাখতে হবে যে পণ্যগুলো যেন একই ধরনের তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন হয়;

গ) নির্বাচিত ফল ও সবজি সংরক্ষণের উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা

ফল ও সবজির প্রকৃতি অনুযায়ী সংরক্ষণের উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার কিছু পার্থক্য রয়েছে। উদ্যান ফসলের সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণাগারের সুপারিশকৃত তাপমাত্রা, অপেক্ষিক আর্দ্রতা ও সংরক্ষণ কাল দেওয়া হলো -

পণ্য	তাপমাত্রা (সে.)	আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	সংরক্ষণকাল
ডাঁটা	০-২°	৯৫-১০০	১০-১৪ দিন
কলা (সবুজ)	১৩-১৪°	৯০-৯৫	১-৪ সপ্তাহ
বাঁধাকপি	০°	৯৮-১০০	৫-৬ মাস
গাজর (পরিপুষ্ট)	০°	৯৮-১০০	৭-৯ মাস

পণ্য	তাপমাত্রা (সে.)	আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	সংরক্ষণকাল
গাজর (অপরিপুষ্ট)	০°	৯৮-১০০	৩-৪ সপ্তাহ
ফুলকপি	০°	৯৫-৯৮	৩-৪ সপ্তাহ
শশা	১০-১৩°	৯৫	১০-১৪ দিন
বেগুন	১২°	৯০-৯৫	১ সপ্তাহ
ঢেঁড়স	৭-১০°	৯০-৯৫	৭-১০ দিন
পাতা পেঁয়াজ	০°	৯৫-১০০	৩-৪ সপ্তাহ
পেঁয়াজ	০°	৬৫-৭০	১-৮ মাস
পেঁপে	৭-১৩°	৮৫-৯০	১-৩ সপ্তাহ
মটরশুটি	০°	৯৫-৯৮	১-২ সপ্তাহ
আলু	৪.৫-১৩°	৯০-৯৫	৫-১০ মাস
মিষ্টি কুমড়া	১০-১৩°	৫০-৭০	২-৩ মাস
মূলা	০°	৯৫-১০০	২-৩ মাস
পালং	০°	৯৫-১০০	১০-১৪ দিন
মিষ্টি আলু	১৩-১৫°	৮৫-৯০	৪-৭ মাস
মুখি কচু	৭-১০°	৮৫-৯০	৪-৫ মাস
টমেটো (পরিপুষ্ট সবুজ)	১৮-২২°	৯০-৯৫	১-৩ সপ্তাহ
টমেটো (পরিপক্ক)	১৩-১৫°	৯০-৯৫	৪-৭ দিন
শালগম	০°	৯৫	৪-৫ মাস

ঘ) স্বল্প খরচের জিরো এনার্জি কুল চেম্বার এর ব্যবহার

ফল ও সবজি সংগ্রহের পর স্বল্পমেয়াদের সংরক্ষণের জন্য **‘জিরো এনার্জি কুল চেম্বারে’** রাখা যায়। **‘জিরো এনার্জি কুল চেম্বারে’** রাখলে ফল বা সবজির সজীবতা ভাল থাকে এবং তুলনামূলক অধিক সময় বাজারজাতকরণের উপযোগী থাকে (শীল, ২০১২)। উদ্যানতত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি শাখা কর্তৃক ডিজাইনকৃত জিরো এনার্জি কুল চেম্বারে গরম পানিতে শোধিত আম (বারি আম-৩) ০.৫% ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগে প্যাকেজিংপূর্বক প্লাস্টিক ক্রেটে রেখে ১৬ দিন পর্যন্ত ভাল রাখা যায়। বারি টমেটো-১৪ ও স্থানীয় জাতের চওড়া পাতাবিশিষ্ট

বাঁধাকপি উল্লিখিত প্যাকেজিং ব্যবস্থায় উক্ত চেম্বারে যথাক্রমে ২৪ ও ১১ দিন বাজারজাতকরণের উপযোগী থাকে। ‘জিরো এনার্জি কুল চেম্বার’ সম্পর্কিত প্রযুক্তি-তথ্য জানতে পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি শাখা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১২. উৎপাদনের সকল পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ-

১২.১. রেকর্ড রাখার সুবিধা

- ফসল এবং ফসলের মাঠ সমন্ধে ভালো ধারণা জন্মাবে যা পরবর্তিতে চাষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে
- সার্বিক জ্ঞান থাকার কারণে উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব হবে
- কোথায় কি কি ধরনের রোগ-বালাই দেখা দেয় তা সম্পর্কে জানা যাবে
- ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে
- প্রতিদিন কাজের শেষে বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে যেমন- বীজ বপনের সময়, সংগ্রহের সময়, রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের সময় ও পরিমাণ ইত্যাদি।
- একটি ফসলের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে রেকর্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমপক্ষে তিন বছর এই ধরনের রেকর্ড রাখতে হবে।

নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের জন্য যে সকল জিনিসের রেকর্ড / তথ্য অবশ্যই রাখতে হবে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

ক) মাঠ সম্পর্কিত তথ্য ঃ

- মাঠের নাম
- ফসলের মাঠটি কোথায় অবস্থিত তার ঠিকানা
- যে বিশেষজ্ঞ এর কাছে পরামর্শ নেয়া হয়েছে তার নাম, পেশা ও ঠিকানা
- জমির পরিমাণ
- কি ধরনের জমি- সমতল, পাহাড়ি
- কোন জাতের ফসল চাষ করা হয়েছে তার নাম
- চাষের বছর।

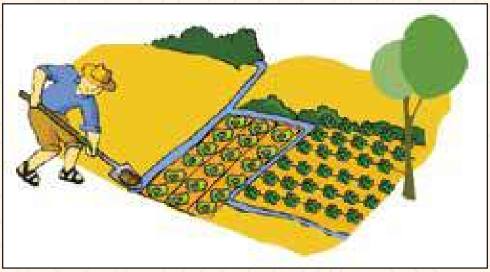

খ) আয়-ব্যায়ের হিসাব

- বীজ ক্রয়ের মূল্য এবং মোট খরচ
- রাসায়নিক দ্রব্যাদি (কীটনাশক, বালাইনাশক ইত্যাদি) এবং সারের একক মূল্য ও মোট খরচ
- বিভিন্ন চাষ সরঞ্জামাদির খরচ
- মাঠ কর্মীদের বেতন
- চারা রোপণের সময় মোট খরচ
- ফসল সংগ্রহের সময় মোট খরচ
- পরিবার এবং কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খরচ
- অন্যান্য খরচ (খাবার, পোশাক, পরিবহন ইত্যাদি)
- উৎপাদন থেকে মোট আয়
- উৎপাদন ব্যতীত আয় (চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি)
- অন্যান্য আয়
- ফসল বিক্রির মূল্য।

গ) উৎপাদনের গতিপথ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

- বীজ বপন এবং ফসল সংগ্রহের আগ পর্যন্ত তথ্য
- বপনকৃত বীজের মোট পরিমাণ
- ফসলে ব্যবহৃত মোট রাসায়নিক ও জৈব সার এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির পরিমাণ
- রাসায়নিক ও জৈব সার এবং কীটনাশক ও বালাইনাশক প্রয়োগের তারিখ
- রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং সারের নাম এবং কে প্রয়োগ করেছে তার নাম ও ঠিকানা
- জৈব সার এর উৎপত্তি ও প্রকার
- মাঠকর্মীদের নামের তালিকা
- কি ধরনের পোকামাকড় এবং রোগবালাই দেখা দিয়েছিল তার তালিকা।

ঘ) সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

- ফসল সংগ্রহ করার আগ পর্যন্ত রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ও বালাইনাশক প্রয়োগের মোট পরিমাণ
- সংগৃহীত ফসল ডেলিভারি করার সময় মোট শ্রমিকের সংখ্যা
- সংগ্রহের তারিখ/তারিখ সমূহ
- সংগৃহীত ফসলের পরিমাণ
- ডেলিভারি করার তারিখ
- বিলিকৃত ফসলের মোট পরিমাণ
- প্লট/জমির নাম/ ঠিকানা
- ক্রেতার নাম
- চালানের সংখ্যা
- বাহকের নাম, ঠিকানা

ফসল বিক্রির সময় কি কি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখা দরকার

- বাজার সমন্ধে এবং ফসলের মূল্যমান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখা
- প্রতিবেশীদের সাথে পরামর্শ করা এবং বৈঠক করে ফসলের বাজার দর সমন্ধে জানা এবং কোথায় ভালো দরে বিক্রি করা যায় তা ঠিক করা
- অন্যান্য চাষীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা এবং বেশি মূল্যে ফসল বাজারজাত করা।

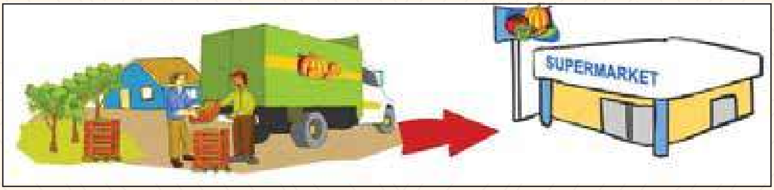

কিভাবে ক্রেতারা বুঝতে পারবে উৎপাদিত ফসলে GAP অনুসরণ করা হয়েছে ?

১. ফসলের বিশেষভাবে প্যাকেজিং দেখে সহজেই সাধারনভাবে উৎপাদিত ফসলের প্যাকেজিং থেকে আলাদা করা যাবে

২. আপনার ফসল যদি বিদেশে বিক্রি হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, আপনার ফসল উৎপাদনে অবশ্যই GAP অনুসরণ করা হয়েছে

৩. উৎপাদিত ফসলের প্যাকেটের গায়ে লেবেল দেখে ক্রেতারা সহজেই বুঝতে পারবে কিভাবে ফসল উৎপাদন করা হয়েছিল।

৪. সর্বোপরি GAP সার্টিফিকেট দেখে ক্রেতারা আশ্বস্ত হতে পারবে যে, ফসল অনুযায়ী উৎপাদন করা হয়েছে

বাংলাদেশে GAP এর সম্ভাবনা

বাংলাদেশে ফল ও সবজি উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। দেশের মোট জনগোষ্ঠির প্রায় ৮০ ভাগই মানুষ কৃষি কাজের সাথে জড়িত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও তাই অনেকটা নির্ভর করে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের উপর। ধান, গম, পাট, ভুট্টা, মসলা, ডাল, তেল জাতীয়

ফসলের সাথে বিভিন্ন ধরনের সবজি এবং ফলমূল ইত্যাদি বাংলাদেশে চাষ হয়ে থাকে। বছরব্যাপী এখন প্রায় সব ধরনের সবজি বাজারে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সর্বত্র এখন ফল ও সবজি চাষের জমি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে এবং কৃষকরা চাষে আরও বেশি আগ্রহী হচ্ছে।

কিন্তু ফল ও সবজি দ্রুত পচনশীল। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, সুযোগ সুবিধার অভাবে এসব পণ্যের ন্যায্য মূল্য কৃষক পায় না। আবার কখনও তারা উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়। অধিকন্তু এসব পণ্য দেশীয় প্রচলিত পদ্ধিতিতে বাজারজাত করার কারণে প্রায় সব উন্নয়শীল দেশে এর শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। আর্থিক ও পুষ্টির বিবেচনায় এ ক্ষতি অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু এ সব পণ্য ক্ষেত থেকে তোলার পর বাজারজাত করা পর্যন্ত কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নিলে এ ক্ষতি সহজেই কমিয়ে আনা যায় । একমাত্র উত্তম কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

সবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতি

ফসল কর্তন হওয়ার পর থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তারপর ভোক্তা কর্তৃক ভোগ করা পর্যন্ত ফসলের যে ক্ষতি হয় তাকেই সংগ্রহোত্তর ক্ষতি বলা হয়। বিগত ১০ বছরে ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ২৫০,০০০ কোটি টাকা (বছরে প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকা)। বাংলাদেশে সবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ ২৫-৪০%।

টেবিল : ফল ও সবজি ফসলের সংগ্রহোত্তর বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষতির পরিমাণ

সরবরাহের স্তর	ক্ষতির পরিমাণ (%)						
	আম	কাঁঠাল	পেঁপে	টমেটো	বেগুন	বাঁধাকপি	শসা
উৎপাদক	৫.৯৬	৬.২৮	৪.২৮	৫.১৭	৬.৩৪	৬.১৪	৪.০২
সংগ্রাহক (ব্যাপারী)	৪.০৭	৭.০৬	৯.০৫	৬.১২	৫.২৬	৫.০৪	৫.০২
আড়ৎদার	৫.৬৭	৪.৪৪	১৩.২৭	৬.৫৫	৫.০২	৪.৪৬	৪.১৭
খুচরা বিক্রেতা	৪.৫৩	৪.২৩	৯.৭৭	৫.৭৯	৫.৫৩	৫.১৬	৭.৪২
ভোক্তা	৮.৬৯	৭.৬১	৭.০৫	৭.৪৬	৯.৮৮	৪.১৪	৩.৬৫
মোট	২৮.৯২	২৯.৬২	৪৩.৪২	৩১.০৯	৩২.০৩	২৪.৯৪	২৪.২৮

সে অনুযায়ী উৎপাদিত ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন সবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় প্রায় ৭.৫ থেকে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন। এ ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জরুরি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আমাদের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ কমে খাদ্য উদ্বৃত্ত হবে এবং কৃষকের আয় প্রায় ১৯% বৃদ্ধি পাবে। যা একমাত্র উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুযায়ী ফসল উৎপাদনের মধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব।

বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদা ও সরবরাহ

২০২৫ সালে দেশে চাহিদা দাঁড়াবে বর্তমান উৎপাদনের ৩০% বেশি। এছাড়াও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা মেটাতে গেলে বর্তমানের চেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; সবজি (৬৫.০ লক্ষ মে. টন); ফল(১৫.০ লক্ষ মে. টন); মশলা(৭.০ লক্ষ মে. টন); মাছ(২.১ লক্ষ মে. টন); মাংস(৪১.৫ লক্ষ মে. টন), সুতরাং একদিকে যেমন চাহিদা বাড়ছে অন্যদিকে সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হচ্ছে, বিষয়টি বড় ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ। সুতরাংফসল চাষ ও ফসল কর্তন হওয়ার পর থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তারপর ভোক্তা কর্তৃক ভোগ করা পর্যন্ত যদি সুষ্ঠভাবে উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় তবে সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে এনে কৃষকের আয় বৃদ্ধি করার সাথে সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব।

বিদেশে ফল ও সবজি রপ্তানির সম্ভাবনা

বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০০ রকমেরও বেশি ফল ও সবজি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। দেখা গেছে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ফলমূল ও শাক-সবজি রপ্তানির পরিমাণ বেড়েই চলেছে, উদাহরনস্বরূপ ১৯৯৩ - ১৯৯৪ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯.৪৪ মিলিয়ন ডলার কিন্তু ২০১২ - ২০১৩ অর্থবছরে তা বেড়ে গিয়ে দাড়ায় ১৮২.২৩ মিলিয়ন ডলার। ২০১২ - ২০১৩ অর্থবছরে মোট শাক-সবজি রপ্তানির প্রায় ৫০% রপ্তানি হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে (সৌদি আরব ২৫.৭২%, ইউ এ ই ৭.৬১%, কুয়েত ৬.৯৭%, কাতার ৬.৯৭%, বাহরাইন ১.৩৯% এবং ওমান ০.৯২%), ইউরোপে ৩১.২৪% (যুক্তরাজ্য ২৪.৬৩%, ইতালি ৪.৭৫%, ফ্রান্স ০.৮৮%, জামানি ০.৪৮%, সুইডেন ০.২৫%, গ্রিস এবং অন্যান্য দেশে ০.২৫%), মালায়েশিয়া ১০.৫৭%, সিঙ্গাপুর ৩.০৫% এবং অন্যান্য দেশে ৫.১৪%। অপরদিকে, মোট ফল রপ্তানির ৯৩.৯৪% রপ্তানি হয়েছিল ভারতে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ৪.৩% (সৌদি আরব ১.৫০%, ইউ এ ই ০.৫%, কুয়েত ১.৬০%, কাতার ০.৫০%, এবং বাহরাইন ০.২০%), ইউরোপে ০.৪২% এবং অন্যান্য দেশে ১.৩৪%. উপরোক্ত রপ্তানির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা। সেক্ষেত্রে, যদি GAP অনুযায়ী চাষ করা যায় এবং GAP সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ সৃষ্টি হয় তাহলে বাংলাদেশি অধ্যুষিত বাজার ছাড়াও পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন বাজারে ফল ও সবজি রপ্তানি বরা সম্ভব হবে।

উত্তম কৃষি পদ্ধতির গুরুত্ব

যে সব কারণে প্রকৃতপক্ষে ফল ও শাক-সবজি উৎপাদনের সময় এবং উত্তোলনের পর নষ্ট হয়ে যায় তা হলো - মেটাবলিক পরিবর্তন, জলীয় অংশ কমে যাওয়া, অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়, সঠিক উপায়ে ফসল উৎপাদন না করা, তোলার সময়

আঘাতজনিত কোন ক্ষত, সঠিক উপায়ে বাছায় ও গ্রেডিং না করা, ভুল উপায়ে প্যাকেজিং এবং পরিবহন এবং পণ্যের চলমান বর্ধন ও রোগের আক্রমণ।

উত্তম কৃষি পদ্ধতি কি করে ?

উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে প্রায় শতভাগ ফসল নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়-

ক) উৎপাদন পর্যায়

১. **উত্তম কৃষি পদ্ধতি** অনুসারে জমি চাষ করার আগে সেই জমির মাটি অবশ্যই পরীক্ষা করা হয় যার মাধ্যমে জানা যায় জমিতে কি পরিমাণে বিভিন্ন পুষ্টি বিদ্যমান আছে এবং কি পরিমাণ দরকার, তাছাড়া মাটিতে দূষণকারী কোন ধাতব পদার্থ আছে কিনা তাও জানা যায়।

২. **উত্তম কৃষি পদ্ধতি** জমিতে ফসল চাষের আগে নির্বাচিত ফসলের বীজ ও বীজতলা সঠিক উপায়ে শোধন নিশ্চিত করে। যার ফলে সতেজ, সুস্থ সবল ও রোগমুক্ত চারা উৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে।

৩. **উত্তম কৃষি পদ্ধতি** কীটনাশক অথবা বালাইনাশক এর সবচেয়ে উত্তম উপায়ে প্রয়োগ নিশ্চিত করে যার ফলে মাটি, পানি, ফসল, সাধারণ মানুষ এবং পরিবেশ বিভিন্ন প্রকার দূষণ থেকে রক্ষা পায়।

৪. **উত্তম কৃষি পদ্ধতি** অনুসারে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য মাঠে সুন্দর কৃষি পরিবেশ বজায় থাকে এবং দূষণের ফলে অসুস্থ হওয়ার কারণে যে অতিরিক্ত খরচ হয় তা থেকে কৃষক রক্ষা পায়।

৫. **উত্তম কৃষি পদ্ধতি** অনুসারে বিশ্বস্ত কৃষি বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শ অনুযায়ী নির্দেশিত মাত্রায়, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কীটনাশক অথবা বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হয় যাতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সাথে সাথে রোগ-বালাই দমন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ফসলের আশানুরুপ ফলন নিশ্চিত হয়, এবং না জেনে বেশি পরিমাণে প্রয়োগের ফলে যে অতিরিক্ত খরচ হয় তা থেকে কৃষক সাশ্রয়ী হতে পারে।

৬. **উত্তম কৃষি পদ্ধতি** অনুমোদিত সার ব্যবস্থাপনা গাইডের নির্দেশিত মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলে বিভিন্ন মাত্রা ও পদ্ধতি মোতাবেক সার প্রয়োগ নিশ্চিত করে যার ফলে প্রত্যেক ফসল তার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে, ফলে সারের অপচয়জনিত অতিরিক্ত খরচ ও দূষণ রোধ করা যায় এবং ফসল ভালো ফলন দিতে সক্ষম হয়।

৭. **উত্তম কৃষি পদ্ধতি** অনুসরণ করে সঠিক নিয়মে, সঠিক জায়গায় এবং সঠিক উপায়ে জৈব সার উৎপাদন করা যায়, যাতে করে মাঠকর্মী, ফসল এবং মাটি বিভিন্ন রকম রোগ-জীবাণু থেকে মুক্ত থাকে।

৮. **উত্তম কৃষি পদ্ধতি** বেশি বেশি জৈব সার ব্যবহারের সুপারিশ করে, ফলে মাটির গুণাগুণ বজায় থাকে এবং অধিক ফলনের সাথে দীর্ঘ মেয়াদে ফসল চাষ করা যায় এবং রাসায়নিক সারের পরিমাণ কমিয়ে এনে উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব হয়।

৯. **উত্তম কৃষি পদ্ধতি** উৎপাদন থেকে **শুরু** করে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পর্যায়ের যে কোন সময় জীবাণুমুক্ত এবং সঠিক উপায়ে পানির ব্যবহার নিশ্চিত করে।

১০. পরিশেষে, উপরোক্ত সকল পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে উৎপাদন পর্যায়ে যে ৬-৭% ফসল নষ্ট হয় তা অনেকংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

খ) ফসল সংগ্রহকালীন সময়

১. সাধারন কৃষি কাজে কৃষকরা গাছ থেকে টেনে-হিচড়ে ফল ও সবজি সংগ্রহ করে যার ফলে গাছে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং রোগবালাই সহজেই প্রবেশ করতে পারে। অন্যদিকে, উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুসারে সিকেচার দিয়ে ফসল সংগ্রহ করতে হয়, এতে গাছের তেমন কোন ক্ষতি হয় না এবং রোগবালাইও সহজে প্রবেশ করতে পারে না ফলে অতিরিক্ত কীটনাশক অথবা বালাইনাশক প্রয়োগের খরচ থেকে কৃষক বেঁচে যায়।

২. উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুযায়ী ফসল অবশ্যই প্লাস্টিক ক্রেটে সংগ্রহ করতে হয় এবং সংগ্রহের পর পর ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হয় যাতে করে রোদ্রের কারণে ফলমূল ও শাকসবজি কুচকে যায় না ফলে ফসল দীর্ঘ সময় সতেজ থাকে এবং বাজার দর বেশি পাওয়া যায়।

গ) সংগ্রহোত্তর পর্যায়

১. ফল ও শাক-সবজি সংগ্রহের পর পর ছায়াযুক্ত স্থানে রাখার সাথে সাথে বরফ মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানি অথবা টিউবয়েলের ঠাণ্ডা পানি দ্বারা শীতলীকরণ করতে হয় যাতে ফসলের শ্বসন প্রক্রিয়ার হার অনেকাংশে কমে যায় এবং ফল ও শাক-সবজির জীবনকাল বেড়ে যায় ও ফসল সতেজ দেখার কারণে বাজার মূল্যও বেড়ে যায়।

২. সঠিক উপায়ে স্যানিটাইজারের মাধ্যমে ফসল পানিতে পরিষ্কারের কারণে বিভিন্ন প্রকার রোগজীবাণু থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়। যাতে করে পরিবহণ এবং সংরক্ষণের সময় ফসল সতেজ এবং রোগজীবাণুমুক্ত থাকে এবং বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়।

৩. ফসলের সর্টিং এবং গ্রেডিং করা উত্তম কৃষি পদ্ধতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ যারফলে যে কোনো ফসলে মূল্য সংযোজন করা যায়।

৪. উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুসারে লাইনারের মাধ্যমে প্লাস্টিক ক্রেটে পণ্য পরিবহণ করতে হয় যারফলে পরিবহণজনিত সংগ্রহোত্তর ক্ষতি থেকে কৃষক/ব্যাপারী/ব্যবসায়ী সবাই রক্ষা পায়। অথচ যেখানে বর্তমান পদ্ধতিতে চটের বস্তায় পরিবহণের ফলে প্রায় ১২-১৫% ফসল নষ্ট হয়।

৫. উত্তম কৃষি পদ্ধতি মডিফাইড এটমোসফেয়ার প্যাকেজিং সিস্টেমকে উৎসাহিত করে ফলে সাধারণ প্যাকেজিং পদ্ধতির চেয়ে বেশিদিন ফসল সতেজ থাকে এবং ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে এবং সর্বোপরি বাজার দর বেশি পাওয়া যায়।

৬. সংগ্রহকালীন সময়ে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে ফসলে মূল্য সংযোজন করা সম্ভব।

৭. উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুযায়ী সংগ্রহোত্তর সময়ে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে প্রায় ২৫-৩০% সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমিয়ে ফসলে মূল্য সংযোজন করা যায়।

উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) এবং সাধারন কৃষি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) কি, কিভাবে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) বাস্তবায়ন সম্ভব, আমাদের দেশে উত্তম কৃষি পদ্ধতির সম্ভাবনা এবং গুরুত্ব কতটুকু সে সম্বন্ধে জানা গেছে। তারপরও একজন সাধারন মানুষ কিভাবে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) কে সাধারন কৃষি পদ্ধতি থেকে খুব সহজেই আলাদা করতে পারবে তা নিম্নে বিভিন্ন ফটোগ্রাফের মাধ্যমে আলোচনা করা হলো-

উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP)

পরিবারের সদস্যগণ স্বাস্থ্যকর এবং গুণগতমান সম্পন্ন খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবেন।

সাধারন কৃষি পদ্ধতি (No GAP)

অস্বাস্থ্যকর ও দূষণযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব।

- স্বাস্থ্যবান মাঠকর্মী
- রোগাক্রান্ত মাঠকর্মী

- শিশুদের স্কুল গমন নিশ্চিত করে
- শিশুদের স্কুলে গমনের পরিবর্তে কাজে নিয়োজিত করা

- উচ্চ গুণাগুণ সম্পন্ন ফসল উৎপাদনের ফলে স্থায়ী উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বিদেশে ফসল রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়
- নিম্ন গুণাগুণ সম্পন্ন ফসল উৎপাদনের কারণে বাজার হারানো এবং ফসল বাজারজাতকরণের অযোগ্য হয়

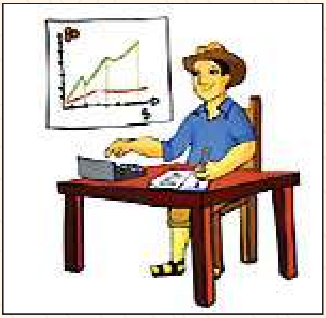

● নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন নিশ্চিত করে

● দুশ্চিন্তা এবং হতাশা তৈরি করে

● গৃহপালিত পশুর সঠিক যত্ন, দূষণমুক্ত ফসলের মাঠ ও টয়লেট এবং উন্নত অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব।

● রোগাক্রান্ত গৃহপালিত পশু, দূষণযুক্ত ফসলের মাঠ, টয়লেট এবং ভঙ্গুর অবকাঠামোর সৃষ্টি হয়।

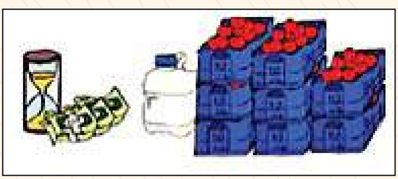

● অল্প উৎপাদন খরচ (রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার), অধিক ফলন, ফসলের উচ্চ বাজার মূল্য ও অধিক আয়।

● অধিক উৎপাদন খরচ (রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার), ফলনের স্বল্পতা, ফসলের স্বল্প বাজার মূল্য ও স্বল্প আয় পাবেন।

বাংলাদেশে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) বাস্তবায়নে এখনি যা প্রয়োজন

বাংলাদেশে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) বাস্তবায়নে যেসব বিষয়ের উপর জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ নজর দিতে হবে তা হলো-

১. প্রথমত, সাধারন মানুষের মাঝে সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যপকহারে প্রচারণা প্রয়োজন।

২. দ্বিতীয়ত, সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ের কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকদের GAP সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

৩. অতঃপর কৃষক, মাঠকর্মী, আরতদ্দার, ব্যবসায়ী, পরিবহন মালিক, বিক্রেতা এবং ক্রেতা ইত্যাদি সকল শ্রেণির মানুষ যারা কৃষি কাজ এবং কৃষি ফসলের সাথে জরিত তাদের সকলকে GAP সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. সরকারি বিভিন্ন কৃষি প্রতিষ্ঠান যেমন- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থা ইত্যাদি সমন্বয়ে সবধরনের ফল ও শাক-সবজির জন্য বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা এবং সুযোগ সুবিধার উপর ভিত্তি করে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) সম্পর্কিত নির্দিষ্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

   বি. দ্র. ইতিমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর শস্য বিভাগ কর্তৃক আম ও টমেটোর উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) ম্যানুয়াল, বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

৫. সরকারি অথবা বেসরকারি উদ্যেগে বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে কৃষক কমিউনিটি গড়ে তুলতে হবে।

৬. উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) সম্পর্কিত নিতিমালা বাস্তবায়নের পর যে সকল কৃষক/কৃষক কমিউনিটি অথবা কৃষি প্রতিষ্ঠান নীতিমালা অনুযায়ী চাষ করতে আগ্রহী তাদের GAP সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী চাষ করার পর একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে উৎপাদনের সকল পর্যায়ে GAP অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা সঠিক উপায়ে যাচাই করার পর সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. বিশ্বব্যাপী যে সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান GAP নিয়ে কাজ করে (যেমন- FAO) তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে একটি আন্তর্জাতিক GAP মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা যে সকল কৃষক/কৃষক কমিউনিটি অথবা কৃষি প্রতিষ্ঠান GAP সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের চাষাবাদ পদ্ধতি মূল্যয়ন করাতে হবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ফল ও শাক-সবজি রপ্তানি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার

GAP সম্পর্কিত সচেতনতার মাধ্যমে যদি বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফল ও সবজি উৎপাদনে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, তাহলে উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে প্রায় শতভাগ ফসল নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা যাবে। যাতে করে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে। কৃষকের মাঠে দীর্ঘ মেয়াদী ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে। মাটির গুণাগুণ বজায় থাকবে, সকল প্রকার দূষণ থেকে ফসল রক্ষা পাবে। উপরন্তু বিদেশে ফল ও সবজি রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে এবং কৃষকের আয় প্রায় ২০% বৃদ্ধি পাবে ।

—— o ——

Publication No. 18 bklt/2016-17

Editorial & Publication
Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI)
Joydebpur, Gazipur-1701, Bangladesh
Phone: +88-02-49270038
E-mail: editor.bjar@gmail.com
www.bari.gov.bd